2 – year B. Ed Programme

Part – I

Paper III : Contemporary Issues and Development in Education

UNIVERSITY OF BURDWAN

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

Golapbag, P.O – Rajbati,

Burdwan – 713 104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী)
(একক- ১,২,৩)

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
কালনা কলেজ (বি.এড. বিভাগ)
কালনা, বর্ধমান।

অধ্যাপক তারাপদ চ্যাটার্জী
(একক- ৪,৫,৬,৭,৮)

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
গলসী বি.এড. কলেজ, বর্ধমান।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

CONTENTS

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
একক - ১ :	শিক্ষার ইতিহাসে এদেশে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী কমিটি এবং কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন	১
একক - ২ :	স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে এদেশে শিক্ষক ইতিহাসে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী কমিটি ও কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন : রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩), কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং PoA (১৯৯২)	১৩
একক - ৩ :	স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ	৩১
একক - ৪ :	শিক্ষায় একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৪০
একক - ৫ :	গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অফ ইউনেস্কো -২০০০	৫৭
একক - ৬ :	সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা	৭৮
একক - ৭ :	শান্তি শিক্ষা	৯৫
একক - ৮ :	শিক্ষায় বর্তমান সমস্যা ও উন্নতি	১১১

একক ১

শিক্ষার ইতিহাসে এদেশে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী কমিটি এবং কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন :

(Brief review of the Contribution of various major committee and Commissions on education : (Pre-Independence wood's Despatch, Hunter commission and Sargent Report)

বিন্যাস

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কমিশনের অবদান :

১.৩.১ উড়ের ডেসপ্যাচ

১.৩.২ হান্টার কমিশন

১.৩.৩ সার্জেন্ট রিপোর্ট

১.৪ সংক্ষিপ্তকরণ (আসুন সংক্ষেপ করি)

১.৫ অনুশীলনী (অগ্রগতি যাচাইমূলক প্রশ্ন)

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা :

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও উনিশ শতকের সূচনাপর্বে শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সরকারি নীতি বা সদর্থক আইন-কানুন রূপায়ন হতে দেখা যায় না। ফলে সরকারী উদ্যোগে এবং শিক্ষাবিস্তারের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী নীতির সেসময় বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সনদ আইনের' শিক্ষাধারাকে সরকারী পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ঘোষণা করলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও 'সনদ আইনের' ৪৩-ধারায় লিপিবদ্ধ বয়ান-টি কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করে—"" এহেন শিক্ষাবিস্তারের ব্যাখ্যা নিয়ে বহু জটিলতা থাকলেও পরবর্তী কালে লর্ড বেন্টিঙ্কের হস্তক্ষেপে ১৮৩৫ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী সেকালে এই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্বের শিক্ষার ইতিহাসে এর পরবর্তী পর্যায়ে 'উডের ডেসপ্যাচ' এবং আরো পরে 'হান্টার কমিশন' ও 'সার্জেন্ট রিপোর্ট-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

১.২ উদ্দেশ্য :

আলোচ্য এককটি পাঠের পর আপনি—

- ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায় সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে জ্ঞানলাভ করা যাবে।
- উডের ডেসপ্যাচের পটভূমি জানতে পারবেন।
- উডের ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি জানতে পারা যাবে।
- উডের ডেসপ্যাচকে কেন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 'ম্যাগনা-কার্টা বলা হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধেও বোধ জন্মাবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির বিশেষত্ব হান্টার কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে জানার সুযোগ ঘটবে।
- সার্জেন্ট পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ ঘটবে।
- জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে সামগ্রিক রূপে সার্জেন্ট রিপোর্ট কে মূল্যায়ন বলা হয় কেন সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে এবং বিচার করার আগ্রহ হবে।

১.৩ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কমিশনের অবদান :

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্ঠা ও দায়িত্বকে ভারতীয়দের মধ্যে কোনভাবেই অর্পন করা হয়নি। ফলে বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ছাপিয়েও এদেশে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে নির্দিষ্ট সরকারি আইনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তারের ইতিহাসে বহু শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং কমিশনের নাম উল্লেখ করা যায়—

- উডের ডেসপ্যাচ
- হান্টার কমিশন
- সার্জেন্ট রিপোর্ট ইত্যাদি

১.৩.১ উডের ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch) :

পুরোনো সমস্যার নিরসন ঘটানো এবং নতুন কোন জটিলতা যেন না ঘটে—তার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ১৮৫৪ সালে সভাপতি চার্লস উডের **(Wood)** নামকরণে রচিত শিক্ষা দলিল 'উডের ডেসপ্যাচ' নামে সুপারিশ হল।

- **উডের ডেসপ্যাচ বর্ণিত শিক্ষার লক্ষ্য :**

ক) পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রভাবে সুযোগ্য, নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বিশ্বাসী কর্মচারী গড়ে তোলা।

খ) ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানে বিকাশ সাধন।

গ) এইসমস্ত কর্মচারীদের ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতন ও সুযোগ করে গড়ে তোলা।

ঘ) মূলতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচেষ্টা থাকবে ভারতে এবং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা এবং দর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

- **উডের ডেসপ্যাচে বর্ণিত শর্তাবলী :**

ক) আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

খ) সরকারি পরিদর্শকের অধিকার হবে অবশ্যস্বীকার্য বিষয় এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়

গ) স্থানীয় পরিচালনার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ) শিক্ষার্থীদের কাছে সামান্যতম বেতন নেওয়া হবে।

ঙ) মেধাবী এবং সুযোগ্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত 'বৃত্তি' দেওয়ার শর্ত ঘোষণা করা হয়।

- **ডেসপ্যাচে বর্ণিত শিক্ষার মাধ্যম:**

ক) উডের ডেসপ্যাচে সর্বপ্রথম ঘোষিত হয় যে, উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে ইংরেজি ভাষা।

খ) প্রয়োজন হলে তবেই উচ্চবিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দেশজ বিদ্যালয়ে উৎসাহ দান করার উদ্দেশ্য মাতৃভাষাকে মাধ্যম করা যেতে পারে।

গ) গণশিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহ দান করার কথা বলা হয়।

ঘ) উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও স্পষ্টতই উন্নততর পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে ইংরেজিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- **উডের ডেসপ্যাচের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার সুপারিশ সমূহ :**

ক) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা—কোম্পানী অধিকৃত এই পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতেই একটি করে 'শিক্ষা বিভাগ' স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়। জ্ঞানশিক্ষা অধিকর্তা নিয়ন্ত্রণে এই সমস্ত শিক্ষা বিভাগগুলি পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্ঞানশিক্ষা অধিকর্তার অধীনস্থ থাকবেন একদল পরিদর্শক, যাঁরা শেষে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে। অবশ্য পরিদর্শকেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষাদান, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে আগাগোড়া বিশেষ সহযোগিতা ও সতর্কতার সঙ্গে পরামর্শ দান করবেন।

খ) উড ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশটি। স্পষ্টতই কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই—এই তিনটি স্থানে সেসময়ের 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করা হয়।

গ) গণশিক্ষার বাহন মাতৃভাষাকে উৎসাহ দান করার কথা বলা হয়।

ঘ) উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও স্পষ্টতই উন্নততর পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে ইংরেজিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- **উডের ডেসপ্যাচের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা সুপারিশ সমূহ :**

ক) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ — কোম্পানী অধিকৃত এই পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতেই একটি করে 'শিক্ষা-বিভাগ' স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়। জ্ঞানশিক্ষা-অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণে এই সমস্ত শিক্ষা-বিভাগগুলি পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্ঞানশিক্ষা অধিকর্তার অধীনস্থ থাকবেন একদল পরিদর্শক, যাঁরা শেষে সরকারের কাছে বার্ষিক রির্পোট পেশ করবেন শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে। অবশ্য পরিদর্শকেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষাদান, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা সম্পর্কে আগাগোড়া বিশেষ সহযোগিতা ও সতর্কতার সঙ্গে পরামর্শ দান করবেন।

খ) উড ডেসপ্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশটি। স্পষ্টতই কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই—এই তিনটি স্থানে সেসময়ের 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের' আদলে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করা হয়। প্রধানত এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে পরীক্ষা গ্রহণকারী এবং ডিগ্রি প্রদেয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং পাঠদান প্রক্রিয়ার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গ) উড ডেসপ্যাচে প্রণোদিত শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় সবথেকে নিচে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ঠিক এর উপরেই থাকবে মহাবিদ্যালয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সবথেকে উপরে থাকবে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ডেস্যপ্যাচে বারংবার আলোকপাত করে। এভাবেই শিক্ষা-বিস্তারের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনার পূর্ণ প্রয়াস দেখা যায় উডের ডেসপ্যাচে।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বসাধারণের সুবিধার কথা ভেবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের ঘোষণা করে উডের ডেসপ্যাচে। একই পাশে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়। জনশিক্ষার সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে।

ঙ) উডের ডেসপ্যাচে কতগুলি শর্তসাপেক্ষে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে 'বেসরকারী প্রচেষ্টাকে' উৎসাহ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এর মূল কারণ উড ডেসপ্যাচের সভাপতি এবং সদস্যরা বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন যে, সমগ্র দেশজুড়ে এইধরনের ব্যাপক পরিকল্পনা হয়তো এককভাবে সরকারের পক্ষে সুপরিচালনা করা অসুবিধাজনক।

- **উডের ডেসপ্যাচ এবং শিক্ষক শিক্ষণ:**

ক) বিশেষত শিক্ষকদের আদর্শ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়।

খ) সরকারি বহু আকর্ষণীয় ক্ষেত্রের মতই 'আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র' রূপে 'শিক্ষাকর্তা-কে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

গ) প্রেষণা-দানের পূর্ণ সদিচ্ছায় 'শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের' সরকারি বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

- **উডের ডেসপ্যাচ এবং বৃত্তিশিক্ষা :**

ক) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন এবং চিকিৎসার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়।

খ) শিল্প শিক্ষার আণুকূল্যে বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করা হয় উডের ডেসপ্যাচে।

- **উডের ডেসপ্যাচে এবং কতকগুলি অন্যান্য সুপারিশ:**

ক) বেশ কতগুলি বিষয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বজায় রাখা সরকারি কর্তব্য বলে ডেসপ্যাচে সুপারিশ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনগ্রসরতা দূরীকরণ'-এর একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত বা সুপারিশ। কিন্তু মিশনারীদের প্রাধান্য দিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একটি 'বাইবেল' রাখার নির্দেশ দান করা হয়।

খ) মুসলিম শিক্ষার অনগ্রসরতা দূর করে সরকারি প্রচেষ্ঠা বা হস্তক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে উডের ডেসপ্যাচে দৃঢ়ভাবে।

গ) সামগ্রিক ভাবে নারীশিক্ষার অগ্রগতির প্রসঙ্গে উডের ডেসপ্যাচে সুপারিশ করা হয় দৃঢ়ভাবে।

- **উডের ডেসপ্যাচের সমালোচনা**

ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে যে 'বণিকসুলভ মনোভাবের' পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের পূর্ণ অধিকার উডের ডেসপ্যাচে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি। জাতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা অনুযায়ী ডেসপ্যাচে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো' প্রস্তুত হতে দেখা যায়নি। এসমস্ত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক জেম্‌স্ উডের ডেসপ্যাচকে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 'ম্যাগ্‌না কার্টা'-নামে ভূষিত করেছেন। এর প্রধানতম কারণ ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে আগে যা কিছু ছিল, তা উডের ডেসপ্যাচে পরিণতি পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে যতখানি প্রগতি ঘটে চলেছে তাকে উৎস হিসেবে এই ডেসপ্যাচকে আলোকপাত করা যায়।

১.৩.২ হান্টার কমিশন (১৮৮২)

প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন ১৮৮২ সালের ৩-রা ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইয়সরয় লর্ড পিরনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেনি এবং বেসরকারী হস্তক্ষেপের প্রসারের বিষয় উড ডেসপ্যাচে বর্ণিত হয়েছে শুধুমাত্র। স্যার উইলিয়ম হান্টার হলেন প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি, যিনি ছিলেন বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য।

- **হান্টার কমিশনের লক্ষ্য :**

ক) উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করা।

খ) বেসরকারি হস্তক্ষেপের উপর সরকারি প্রচেষ্টার নীতি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

গ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কি হবে তা স্থির করা।

ঘ) সর্বোপরি, প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে সরকার কতখানি উদাসীন ছিলেন, আরো কতটা সচেতন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

- **হান্টার কমিশনের সুপারিশ**

ক) বাস্তবে সরকারি অনুদান পদ্ধতিকে এমনভাবে কার্যকরী করে তুলতে হবে যেন বেসরকারি প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারি প্রচেষ্টার সুপ্রয়োগ ঘটাতে হবে।

খ) বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে উড্ ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতি কার্যকরী হয়নি। এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশও এর ব্যতিরেক নয়। এ সব ক্ষেত্রেও সরকারকে শিক্ষার মত কতগুলি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বেসরকারি প্রচেষ্টার কাছে হস্তান্তর করতে হবে নির্দ্বিধায়।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে এরপর হান্টার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করলেন—

প্রাথমিক শিক্ষা :

সামগ্রিক শিক্ষার ইতিহাসে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের মতামতগুলি বিশেষ মূল্যবান।

১। প্রশাসন :

ক) নিজস্ব এলাকার বিদ্যালয়গুলির ভার গ্রহণ করবে 'এক-একটি জেলা বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড।

খ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করবে 'জেলা এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ড।'

গ) ক্রমে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে অনুদান দেওয়া হবে সরকারি শিক্ষাখাতের তিন ভাগের এক ভাগে।

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে সমস্ত খাতে ব্যয় মঞ্জুর করা হবে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল 'স্থানীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্বের' সমগ্র অংশ।

২। পাঠ্যসূচি :

ক) পাঠ্যসূচি হবে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সক্রিয়তাভিত্তিক।

খ) জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষায়।

গ) পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়গুলি হবে যথাক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞান, গণিত, হিসাব শিক্ষা, পরিমিতি, শারীর বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পকলা, জমি জরীপ প্রভৃতি।

ঘ) বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, দেশীয় কিছু যোগাসন, ব্যায়াম, ড্রিল ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে যা তাদের মানসিক বিকাশও সাধন করবে।

৩। বিবিধ বিষয় :

ক) জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বেতন নেওয়া হবে।

গ) ব্যতিক্রম নিয়মানুযায়ী কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে বিনা বেতনে পাঠলাভের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

১। প্রশাসন :

ক) 'গ্রান্ট-ইন-এড' বা কতগুলি আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ক্রমে বেসরকারি কতৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব সমূহ।

খ) অবশ্য এই বিষয়েও আলোকপাত করা হল যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখার জন্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে আদর্শ সরকারি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকে।

গ) সরকার অবশ্যই সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে তথা তত্ত্বধানে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে বিশেষত 'অনগ্রসর অঞ্চলের ক্ষেত্রে'।

২। পাঠ্যক্রম :

ক) সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে হান্টার কমিশন দুটি অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন— 'এ কোর্স' এবং 'বি-কোর্স'। কোর্সের জন্যে পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়াবলি। 'বি-কোর্সে'-র অন্তর্গত বিষয়গুলি হল, সাহিত্য-বহির্ভূত কারিগরি বিষয় এবং বৃত্তি শিক্ষার জন্যে ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়গুলি।

খ) হান্টার কমিশনে স্পষ্টতই ঘোষণা করা হল যে অষ্টম শ্রেণির পরে শিক্ষার্থীরা 'এ কোর্স' অথবা 'বি-কোর্স' ভেঙ্গে নিতে পারবে সম্পূর্ণ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী।

৩। শিক্ষার মাধ্যম :

ক) হান্টার কমিশনের সদস্যগণ শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ বা ঘোষণা করেননি।

খ) এই মত বহুজনস্বীকৃত হলেও অনুমানসাপেক্ষ যে, মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজি ভাষাই প্রাধান্য লাভ করেছিল এই কমিশনের দ্বারা।

- **উচ্চশিক্ষা:**

প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও কতগুলি জরুরি বিষয় উপস্থাপিত হতে দেখা যায়—

ক) মহাবিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে।

খ) অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে কিছু দুরস্থ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীকে।

গ) আন্তরিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দান করতে হবে।

ঘ) মহাবিদ্যালয় অথবা উচ্চশিক্ষার কোনো খাতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, অধ্যাপকদের প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রসংখ্যা, গ্রন্থগায় এবং পরিচালনায় ক্ষেত্রে ব্যয় প্রভৃতি হবে বিচার্য বিষয়।

- **শিক্ষক-শিক্ষণ :**

ক) হান্টার কমিশনের সদস্যরা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্যে শিক্ষক-শিক্ষানের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

খ) প্রতিটি মহকুমার একটি করে 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করতে হবে 'শিক্ষর-শিক্ষনের' প্রসারের জন্যে।

গ) 'নর্মাল স্কুলে' গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকালে থাকবে অন্যদের তুলনায় কিছুটা কম।

- **নারী শিক্ষা**

ক) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক নর্মাল স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয় এই কমিশনের সদস্যদের দ্বারা।

খ) বিশেষত নারীশিক্ষার প্রগতির উদ্দেশ্যে বেসরকারি বালিকা বিদ্যলয়গুলিকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করায় ঘোষণা করা হয়।

গ) নারীশিক্ষা প্রসারের জন্যে মহিলা পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশ ও করা হয়ে থাকে।

- **বিশেষ শিক্ষা :**

ক) বিশেষ শিক্ষার সুপারিশ করা হয় হান্টার কমিশনে বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

খ) বেশি সংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সুপারিশ জানানো হয়।

গ) প্রয়োজন মত 'মুসলমান পরিদর্শক' নিয়োগ করার জন্যেও সুপারিশ করা হয়।

- **হান্টার কমিশনের সমালোচনা**

ক) প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের বা হান্টার কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্ব লাভ করলেও তা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়নি।

খ) দেশীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দানের মাধ্যমে এই কমিশন জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছিল বলা যেতে পারে।

গ) 'এ-কোর্স' ও বি-কোর্স'- সংক্রান্ত শিল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এর ফল ভবিষ্যতে আরো বেশি ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ঘ) বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তর অবধি সরকারি এবং বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় সাধন হয়ে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার প্রসার সদর্থক পথে ধাবিত হয়েছে।

- **সার্জেন্ট রিপোর্ট বা যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৪৪) :**

১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন স্যার জন সার্জেন্ট। এই সময় বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে ইংল্যান্ডে 'বাটলার আইনের' প্রভাবে। কাজেই যুদ্ধোত্তর

ভারতবর্ষের শিক্ষা পরিকল্পনার রচনা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সালের জানুযারী মাসে স্যার জন সার্জেন্টের সক্রিয় ভূমিকায় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি একটি খসড়া পরিকল্পনা তুলে ধরেন, যা পরবর্তীকালে 'সার্জেন্ট রিপোর্ট' নামে পরিচিত হয়।

- **সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশসমূহ :**

সার্জেন্ট রিপোর্টের মূল লক্ষ্য ছিল চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এই রিপোর্টের সুপারিশগুলি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন দিকগুলি আলোকপাত করেছে—

১। প্রাথমিক শিক্ষা :

ক) প্রাথমিক শিক্ষা সবক্ষেত্রে 'বাধ্যতামূলক' হবে না, কিন্তু অবশ্যই হবে সম্পূর্ণ 'অবৈতনিক'।

খ) ৩-৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র 'নার্সারী বিদ্যালয়' স্থাপিত হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারি শ্রেণিও চালু করা হবে।

গ) ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ঘোষণা করা হয়। এই শিক্ষাস্তর থাকবে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত—৬-১১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্যে থাকবে 'নিম্ন বুনিয়াদী স্তর' এবং ১১-১৪ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্যে থাকবে 'উচ্চ-বুনিয়াদী স্তর।'

ঘ) শিক্ষার মাধ্যম থাকবে এই স্তরে 'মাতৃভাষা'।

ঙ) সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রাধান্য লাভ করেছে এখানে। এই স্তরে শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে সামাজিক আচরণ-বিধির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো।

২। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর :

ক) ছয় বছর ব্যাপী প্রসারিত থাকবে এই শিক্ষাস্তর।

খ) ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা রূপে পড়তে হলেও শিক্ষার মূল মাধ্যম হবে 'মাতৃভাষা'।

গ) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে তবেই উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে।

ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব মাত্র নয়।

ঙ) সার্জেন্ট রিপোর্ট মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি ধরনের কথা ঘোষণা করা হল। বিশুদ্ধ কলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে থাকবে অ্যাকাডেমিক হাইস্কুল; আর শিল্প, বাণিজ্য ও ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে থাকবে টেকনিক্যাল হাইস্কুল।

৩। উচ্চশিক্ষা :

ক) মহাবিদ্যালয়ে নির্ধারিত থাকবে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

খ) উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে শুধুমাত্র যোগ্য শিক্ষার্থীরাই।

গ) উচ্চমানের গবেষণাধর্মী শিক্ষাও স্থানলাভ করবে স্নাতকোত্তর শিক্ষাস্তরে।

ঘ) সমন্বয় সার্জন্টের উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় থেকে একটি 'সর্বভারতীয় সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করবে 'ইউনিভার্সিটি গ্যান্টস্ কমিটি সদৃশ।

ঙ) শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে সহজ ও আন্তরিক।

৪। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা :

এই ধরনের শিক্ষাকে চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে—

ক) স্নাতকোত্তর কোর্স করা হয়ে থাকে— স্নাতকোত্তর কোর্স (কারিগরি ও শিল্প বাণিজ্যস্তরে)—এই কোর্সে মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষালাভ করবে জাতীয় প্রতিনিধি স্থানীয় পদে নিযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে। এই পদ্ধতি চালু থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় বা —উচ্চ শিক্ষার কারিগরি কলেজে।

খ) হায়ার টেকনিক্যাল স্কুল—এখানে চার্জম্যান, ফোরম্যান এবং অন্যান্য অফিসাররা বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করে থাকেন পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে।

গ) ৬ বছরের টেকনিক্যাল স্কুল—শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হতে পারবে নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে।

ঘ) নিম্ন কারিগরি বা ট্রেড স্কুল— এখানে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে দু'বছরের উচ্চ বুনিয়াদী কোর্সের শিক্ষা শেষ করে তারপরে।

৫। বয়স্ক শিক্ষা

ক) ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্যক্তিকে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হবে বয়স্ক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

খ) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন ১০-৪০ বছর বয়স অবধি ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই। দিনের বেলায় শিক্ষালাভের আলাদা ব্যবস্থা থাকার কথা বলা হয়েছে। ১০-১৬ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের।

গ) রেডিও, গ্রামাফোন, ম্যাজিক লণ্ঠন, লোকসংগীত, নৃত্য ইত্যাদির সমন্বয়ে বয়স্ক শিক্ষা আকর্ষনীয় করে পরিবেশন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘ) নারীদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকবে এই শিক্ষাক্ষেত্রে।

৬। কর্মসংস্থান :

'এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো' স্থাপনের সুপারিশ করা হয় সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষান্তে কর্মলাভের সুযোগ দানের উদ্দেশ্য।

৭। প্রশাসন :

ক) কেন্দ্রে একটি কার্যকরী সুদৃঢ় বিভাগ খেলায় সুপারিশ করা হয়।

খ) নিজ নিজ স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ থাকার কথা বলা হয় প্রদেশগুলিতেও।

গ) শিক্ষার এহেন নতুন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্য এবং জাতীয় শিক্ষার সঠিক রূপায়নের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আন্তরিক সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশেষভাবে।

৮। শিক্ষক-শিক্ষণ

ক) বিশেষত স্নাতক শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যে নতুন শিক্ষক শিখন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিখন বিভাগ খুলতে হবে।

খ) বিশেষভাবে তিন ধরনের শিখন বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়— স্নাতক হন নি যাঁরা এমন শিক্ষকদের জন্যে ঃ এই ধরনের শিক্ষণে প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং হাইস্কুলে স্নাতক হন নি এমন স্তরের শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষিত হতে পারবেন। কাজেই এই পরিকল্পনায় বহু সংখ্যক শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের বিশেষ সুযোগ ছিল সার্জেন্ট রিপোর্টে।

৯। প্রতি০বন্ধীদের শিক্ষা :

বিশেষভাবে মূক-বধির অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার সুপারিশ জানানো হয় সরকারি শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বে এই রিপোর্টের আনুকূল্যে। সামগ্রিক রূপে জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেন্ট রিপোর্ট 'অতি মূল্যবান দলিল স্বরূপ'।

১.৪ সংক্ষিপ্তকরণ (আসুন সংক্ষেপে পরি) :

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও কমিশনের অবদান তুলে ধরা হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে উডের ডেসপ্যাচে, হান্টার কমিশন এবং সাজেন্ট রিপোর্টের বিবিধ মূল্যবান সুপারিশ তথা গুরুত্ব এবং সমালোচনা ও আলোচনা করা হল।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আলোচনাগুলি শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

১.৫ অনুশীলনী (অগ্রগতি যাচাইমূলক প্রশ্ন) :

১। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচের পটভূমি তুলে ধরুন।

২। উডের ডেসপ্যাচের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

৩। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছিল?

৪। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সার্জেন্ট রিপোর্টের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করুন।

৫। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সার্জেন্ট রিপোর্টের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করুন।

৬। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সার্জেন্ট পরিকল্পনা কী ধরনের ছিল?

৭। সার্জেন্ট রিপোর্টে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কী ধরনের সুপারিশ করা হয়েছিল?

৮। শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসারে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশ কতখানি যুক্তিযুক্ত ছিল বলে আপনি মনে করেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি :

- ভট্টাচার্য, সুকুমারী (১৮৯১), ইতিহাসের আলোকে বৈদিক শিক্ষা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯৫), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলিকাতা - ৭৩।
- হালদার গৌরদাস (১৯৯৮), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা - ৯।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতীয়. পঃ বঙ্গ।
- দাশগুপ্ত, নলিনীভূষণ, ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, কলকাতা বাক্ সাহিত্য।
- Law, N.N. (1916), Promotion of Learning In India during Muhummadan rule, Longnon Gnen & Co. London.
- Altekar, A.S (1957), Education in Ancient India, Nandkishore, Varanasi, U.P.
- Mookherjee, R.K., Ancient Indian Education.
- Naik, J.P and Nurullah, S., History of Education in India.
- Singh, R.P. (1970), Professional Education in Ancient and Mediacval Indian, Arya Book Depot.
- Popal, B. F. (1972), Women's Education in India, S.N. D.T. University.
- Kochhar, S.K. (1981), Pivotal Issues in Indian Education.

একক - ২

স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী কমিটি ও কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন : রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩), কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং POA (১৯৯২)।

Brief review of the contribution of various major committee and commissions on education, set up from time to time after Independence (Specifically) : University Education Commission (1948-49), Secondary Education Commission (1952-53), Indian Education Commission (1964-66), National Policy on Education (NPE 1986) and Programme of Action 1992 (POA-1992).

বিন্যাস

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে কয়েকটি কমিটি কমিশনের অবদান :

- ২.৩.১ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)
- ২.৩.২ মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)
- ২.৩.৩ কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
- ২.৩.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৮৮৬)
- ২.৩.৫ প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (১৯৯২)

২.৪ সংক্ষিপ্তকরণ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা :

১৯৪৭, ১৫-ই আগস্ট ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ভারত সরকার স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে কতগুলি কমিটি ও কমিশনের বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। তাই এই ধরনের শিক্ষার ধারা অবশ্যই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের প্রয়োজনসাধনে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। এই কমিটি কমিশনগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল — রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন, জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ইত্যাদি।

২.২ উদ্দেশ্য :

- ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে স্বাধীনোত্তর পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া।
- রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশগুলি এবং তার গুরুত্বগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।
- মুদালিয়র কমিশনের নির্দেশগুলি ও তার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোকপাত করা।
- কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি তুলে ধরা।
- জাতীয় শিক্ষানীতি (১৮৮৬) বিষয়ক বিষয়গুলি আলোকপাত করা।
- পরবর্তী শিক্ষানীতিতে 'প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন' (POA ১৯৯২) সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং এই প্রসঙ্গে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের' গুরুত্ব তুলে ধরা।

২.৩ স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে কয়েকটি কমিটি কমিশনের অবদান :

বৃটিশের অধীনতা মুক্ত হয়ে (১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট) ভারতবর্ষে আনার প্রচেষ্টা হল এমন শিক্ষাধারা যা ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং জাতীয় জীবনের পরিপূরক। তাই জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন কর্মসূচি গৃহীত হল। অবশ্য ঔপনিবেশিক বৃটিশ প্রভাবকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা গেল না। স্বাধীনোত্তর এই পর্যায়ে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও কমিশন গঠিত হতে দেখা যায় —

- রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)
- মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)
- কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
- জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE) (১৮৮৬)
- প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশন (POA ১৯৯২)।

  [Programme of Action] — ইত্যাদি।

২.৩.১ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯) :

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৪-ঠা নভেম্বর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের কাছে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশ পেশ করা হয়। উচ্চশিক্ষা-সংক্রান্ত সুপারিশগুলি কমিশনের বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

ক) শিক্ষার লক্ষ্য :

- ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা দান।
- নেতৃত্ব গঠনের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।
- কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ঘটানো।
- নতুন জ্ঞান আহরণে উৎসাহ দান এবং জ্ঞানের আদর্শ চর্চা করা।
- সৃজনশীল কর্মে প্রেরণা দান করা।
- গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং তা সঞ্চারিত করা।

খ) শিক্ষার পাঠ্যক্রম :

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন শিক্ষার পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে 'সাধারণ শিক্ষা' এবং 'বৃত্তিমূলক শিক্ষার' কথা বলেছেন।

১। সাধারণ শিক্ষা :

- শিক্ষার্থীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবেন বারো বছর বিদ্যালয় বা সম-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করার পরে।
- তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে পাস ও অনার্স উভয় শ্রেণির জন্যে। অনার্স কোর্সের শিক্ষার্থীরা ১ বছর পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবে এবং পাস কোর্সের শিক্ষার্থীরা ২ বছর পরে এই ডিগ্রি পাবে।

২। বৃত্তিমূলক শিক্ষা :

পেশাগত মনোভাব দ্বারা বিভিন্ন কর্ম অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করার ক্ষেত্রে এই কমিশন কতগুলি বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করেছে —

- কৃষি
- বাণিজ্য
- ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান
- শিক্ষাতত্ত্ব
- চিকিৎসা বিদ্যা এবং
- আইন

৩। ধর্মশিক্ষা :

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আদর্শ শিক্ষাগ্রহণ প্রায় অসম্ভব। এই বিষয়ে কমিশনের মতামত নীচে দেওয়া হল —

- প্রতিদিনের কাজ শুরু করার আগে চিত্ত সংযম করতে হবে নীরবে ধ্যানের মাধ্যমে।
- ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরে।
- শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সর্বজনীন কতগুলি বাণী আলোচনা করা হবে ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বছরে।
- ধর্মতত্ত্বের কিছু সমস্যা নিয়ে মূলত আলোচনা করা হবে ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বছরে।

৪। শিক্ষার মান :

শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল —

- পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া সমস্ত বছর 'কাজের দিন' নির্ধারিত থাকবে ১৮০ দিন।
- ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাবে।
- উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় হতে উজ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনে।
- গবেষণা এবং সৃজনমূলক লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।
- গ্রন্থাগার এবং প্রয়োজনীয় কক্ষের সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। শিক্ষার মাধ্যম :

- সর্বভারতীয় ভাষা হবে হিন্দি-ভাষা।
- আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত ছাড়া একটি ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।
- উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিনটি ভাষা জানার ব্যাপারে সুপারিশ করা হল — আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা ও ইংরেজি।

৬। শিক্ষক :

- শিক্ষক মহাশয় তাঁর আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।
- শিক্ষক হবেন জ্ঞানী, দক্ষ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।
- দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের ওপর নির্ভর করবে শিক্ষক মহাশয়ের পদোন্নতি।

- শিক্ষকদের সাধারণ অবসর গ্রহণের বয়স থাকবে ৬০ বছর অবধি। তবে আরো ৪ বছর বাড়ানো যেতে পারে তাঁর কর্মদক্ষতার নিরিখে।
- রাধাকৃষ্ণণ কমিশন শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে শিক্ষকদের চারটি শ্রেণিতে বিন্যাস করেন — প্রফেসার, রীডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাকটর।

৭। **শিক্ষার্থীদের কল্যাণসাধন :**

- সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে।
- বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা বা শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
- সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বছরে অন্তত একটিবার।

৮। **নারী শিক্ষা :**

- নারী শিক্ষার প্রগতি ও প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হল।
- অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের বেতন সমান হতে হবে।
- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ দিতে হবে।
- পুরুষদের মতই নারীদেরও সমসুযোগ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে বিশেষত সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

৯। **বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন :**

- বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়কেই।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্যে নিয়োজিত থাকবে — পরিদর্শক, আচার্য, উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্‌টিস, বোর্ড-অফ-স্টাডিজ, সিলেকশন কমিটি, ফিনান্স কমিটি।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবশ্যই পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা থাকবে, কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক রূপেই সক্রিয় থাকবে তা নয়।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

- নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমতা রাখা দরকার।
- রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে বস্তুধর্মী প্রশ্নকে যথাযথ মনে করা হয়েছে।
- সম্বৎসরের অভ্যন্তরীণ কর্মের ওপর ভিত্তি করে এক তৃতীয়াংশ নম্বর দিতে হবে।
- যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাশ নম্বর পেতে হবে ৭০, ৫৫ এবং ৪০।

- ‘অনুগ্রহ নম্বরের’ নিয়ম বর্জন করতে হবে।
- মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন করতে হবে অবশ্যই।

১১। ব্যয় পরিচালন :

- রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ব্যয় নির্বহ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে সরকারকে নির্দেশ করে।
- অবশ্য সরকারী কলেজের সমান ব্যয়ভার করতে হবে বেসরকারী কলেজগুলিকেও একথা কমিশনে স্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়।

১২। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় :

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সদস্যদের মতানুযায়ী এদেশীয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন; তাই শিক্ষার ‘সর্বজনীন নীতি’ এখানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। এই অভাববোধ থেকেই রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সদস্যরা গ্রামীণ শিক্ষা সম্পর্কে এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন এবং এভাবেই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

সংগঠন :

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি হবে —

- প্রাথমিক স্তরে ৮ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষালাভ।
- এরপরে ৩ বছরের কলেজীয় শিক্ষালাভ।
- শেষে ২ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষালাভ (উত্তর কলেজীয়) আরো বিশদভাবে এগুলি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে —

  (ক) প্রাথমিক স্তরে কমিশন দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনাকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

  (খ) মাধ্যমিক স্তর

  - এই স্তরে বিদ্যালয় এলাকাটির সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হবে একেকটি আর্দশ পল্লীর মত।
  - দেড়শো জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না বলে কমিশনে সুপারিশ জানানো হয়।
  - দুই ধরনের শিক্ষায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হল — ‘তাত্ত্বিক’ এবং ‘হাতে কলমে’ শিক্ষাদান।
  - এই ধরনের বিদ্যালয় শিক্ষা হবে আবাসিক। ৩০-৬০ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্যে।
  - আবাসিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর মধ্যে শিক্ষকদের বাসগৃহ, বিদ্যালয়গৃহ, ছাত্রাবাস, কৃষিক্ষেত্র, খেলার মাঠ, পশুচারণ ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা থাকবে।

(গ) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর :

- মহাবিদ্যালয়গুলি তিনশো-র বেশি শিক্ষার্থী নেবে না।
- প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা কোনোভাবেই আচ্ছন্ন হবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।
- অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, যার সঙ্গে গ্রাম যুক্ত আছে।
- গ্রামীণ মহাবিদ্যালয়গুলি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে।
- পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত মূল বিষয়গুলি হবে — ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি।

সমালোচনা :

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার রূপায়ণে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার অভিনব ভাবনা এবং কৃষিবিদ্যার প্রতি গুরুত্ব দান এই কমিশনের ক্ষেত্রে প্রশংসীনয় বিষয়। অবশ্য এই কথাও স্বীকার করতে হয় - ধর্মশিক্ষা, টোল-মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা এবং নারী শিক্ষার বিষয়ে এই কমিশনের স্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না।

২.৩.২. মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) :

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে মুদালিয়র কমিশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এই কমিশনের রিপোর্টে পেশ করা হয় ১৯৫৩ সালে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কিত সুপারিশগুলি হল —

১। শিক্ষার লক্ষ্য :

- ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটানো।
- গণতান্ত্রিক নাগরিক প্রস্তুত করা বিশেষত প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে।
- নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা দান করা।
- বৃত্তিমূলক নৈপুণ্য এবং উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা।
- যুব সমাজের উপযোগী নাগরিক তৈরী করা।

২। সাংগঠনিক কাঠামো :

- নিম্ন বুনিয়াদী বা ৪/৫ বছরের শিক্ষালাভ করার পরে তবেই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

- মুদালিয়র কমিশনের মূলত ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের আর্থিক সুবিধার উদ্দেশ্যে এই কমিশন ১২ বছরের বদলে ১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ পেশ করে।

I + II + III + IV + V = ৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা।

VI + VII + VIII = ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা।

IX + X + XI = ৩ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা।

[অর্থাৎ, সর্বমোট = ১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাপাঠ।]

- ইন্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দিয়ে এর বদলে এই কোর্সের ১ বছর যুক্ত হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং আরো ১ বছর ডিগ্রি কোর্সের সঙ্গে যুক্ত হবে।
- মোট ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স হবে।
- গ্রামীণ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে পশুপালন, কৃষি, কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে রাজ্যসরকারকে সচেতন থাকতে হবে।
- কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের প্রাক্-বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করতে হবে বৃত্তিশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে।
- বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হল শিক্ষার্থীদের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

৩। **পাঠ্যক্রম :**

- নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম হবে সকলের জন্যে একই।
- বিশেষীকরণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে হবে। এর পাঠ্যক্রম থাকবে দুই ভাগে বিভক্ত — আবশ্যিক পাঠ ও ঐচ্ছিক পাঠ। শিক্ষার্থী তার পছন্দ মত যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতে পারবে ঐচ্ছিক বিষয় থেকে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় থাকবে —

  ক) তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি),

  খ) অঙ্ক,

  গ) সাধারণ বিজ্ঞান,

  ঘ) হস্তশিল্প,

  ঙ) সমাজবিদ্যা।

- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি থাকবে যথাক্রমে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা এবং চারুকলা।

- নিম্নমাধ্যমিক স্তরে (৮-ম শ্রেণি অবধি) যে সমস্ত বিষয়গুলির সুপারিশ জানানো হয়—

  ক) মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি,

  খ) সাধারণ বিজ্ঞান,

  গ) অঙ্ক,

  ঘ) সমাজবিদ্যা,

  ঙ) শারীর শিক্ষা,

  চ) শিল্প ও সংগীত এবং

  ছ) হাতের কাজ

৪। ভাষা শিক্ষা :

- মাধ্যমিক স্তরে এদেশে শিক্ষার মাধ্যম রূপে থাকবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।
- অন্তত: দুটি ভাষা শিখতে হবে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে (ইংরেজি ও হিন্দি, কিন্তু একই বছরে দুটি ভাষা শিক্ষা নয়।)
- অন্তত দুটি ভাষা পাঠ্য থাকবে (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা) উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে।

পরে অবশ্য 'CABE'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে তিনটি ভাষা শেখার কথা বলা হয় —

ক) আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা,

খ) ইংরেজি বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা এবং

গ) হিন্দি ভাষা বা অপর একটি ভারতীয় ভাষা বিশেষত হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য।

৫। কারিগরি শিক্ষা :

- বহুমুখী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বা স্বতন্ত্রভাবে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার অনেক বেশি সংখ্যায়।
- শিক্ষানবিশ রূপে শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
- নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষাসংস্থার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে।

৬। সহশিক্ষা ও নারীশিক্ষা :

- নারীরাও একসঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে। এর জন্যে শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

- মেয়েদের জন্যে অবশ্য অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার পাশেই গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষালাভের সুযোগ থাকবে।

৭। চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা :

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আদর্শ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে এই কমিশন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করে —

ক. শৃঙ্খলা

খ. সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং

গ. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা

৮। শিক্ষাদান পদ্ধতি :

- নিছক মুখস্থবিদ্যা নয়, সক্রিয়তার সঙ্গে জ্ঞানার্জন।
- গতিশীল শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দান।
- দলগত কর্মে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৯। শিক্ষার্থীদের কল্যাণসাধন :

- বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা।
- বিদ্যালয় নিয়মিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- দলগত খেলাধূলা বা বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষায় গুরুত্বদান।
- 'ফার্স্ট-এইড' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিদ্যালয় কয়েকজন শিক্ষককে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১০। নির্দেশনা ও পরামর্শদান :

- শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে নির্দেশনা ও পরামর্শের ওপর।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্দেশক এবং কেরিয়ার মাস্টার নিয়োগ করা প্রয়োজন প্রতিটি বিদ্যালয়ে।
- বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গে একে-অপরকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক চলচ্চিত্র দেখানো যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মত পরামর্শদানের মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষাগ্রহণে প্রেষণা সঞ্চার করতে হবে।

১১। প্রশাসন :

- সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এবং পরামর্শদানের জন্যে 'রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গড়ে তুলতে হবে প্রতিটি রাজ্যে।

- ‘মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ’ মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে, এর সদস্য থাকবে অনধিক ২৫-জন এবং সভাপতি হবেন ‘শিক্ষা অধিকর্তা’।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পরিচালন সমিতি থাকবে।
- প্রত্যেক সপ্তাহে ছয়দিন পড়াশোনা হবে নিয়ম করে।
- সুযোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিদর্শক’ নিযুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ৫০০-৭৫০-এর মধ্যে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ৩০-৪০-এর মধ্যে।

১২। শিক্ষকের উন্নতি বিষয়ক সুপারিশ :

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ১ বছরের (পরীক্ষাধীন সময় ধার্য) থাকতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগের নীতি একই প্রকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৬০ বছর বয়সে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ করতে হবে।
- স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকাল হবে ১ বছর এবং মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের এই সময়কাল হবে ২ বছর।
- বিনা বেতনে শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারবে।
- পেনশন, জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু থাকবে শিক্ষকদের জন্যে।

১৩। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- আধুনিক বিষয়াত্মক ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে।
- রচনাধর্মী পরীক্ষাব্যবস্থা বা বহিঃপরীক্ষা তুলে দিতে হবে।
- অবশ্য একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে।
- সাংখ্যমানের বদলে স্কুল রেকর্ডে প্রতীক চিহ্নের (A B C D etc.) মাধ্যমে ‘গ্রেডিং ব্যবস্থার’ প্রচলন ঘটাতে হবে।
- বহিঃপরীক্ষার সঙ্গেই ধারাবাহিক বিবরণী পত্রে সংরক্ষিত স্কুল রেকর্ড এবং আন্তঃপরীক্ষার ফলকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিশেষ উপকৃত হবে।

১৪। সমালোচনা :

- ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়নে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি নিঃসন্দেগে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল।
- মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করার সদর্থক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু কমিশন প্রস্তাবিত এই ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যে আরো বেশি সংখ্যক বিদ্যালয় তথা উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন ছিল।
- মুদালিয়র কমিশনে বাণিজ্য, কৃষি, যন্ত্রশিল্প শিক্ষার সুপারিশ ছিল সময়োপযোগী - আরো বাস্তবায়ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল।
- 'সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের' - পরিকল্পনা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু কখনো অতি দ্রুত বিশেষীকরণ ঘটতে দেখা যায়।

২.৩.৩ কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ঃ

১৯৬৪ সালের ১৪-ই জুলাই শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশে মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশন' বা 'কোঠারী কমিশন' গঠিত হয়। সভাপতি ডি. এস. কোঠারীর প্রতিনিধিত্বে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলার কাছে এই কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়।

কোঠারী কমিশনের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি তুলে ধরা যেতে পারে —

১। শিক্ষা কাঠামো :

- প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকাল হবে ১-৩ বছরের।
- নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাকাল হবে ৪ বা ৫ বছরের এবং উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা হবে ৩ বা ২ বছরের। অর্থাৎ সর্বমোট প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব হবে ৭ বা ৮ বছরের।
- নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষাকাল হবে ৩ বা ২ বছরের।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২ বছরের সাধারণ শিক্ষা অথবা ১-৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা থাকবে।
- উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রথম ডিগ্রি লাভের শিক্ষা হবে ৩ বছরের বা তার চেয়ে বেশি সময়ের শিক্ষান্তে।
- অবশ্য দ্বিতীয় ডিগ্রির জন্যে শিক্ষাকাল হবে একটু স্বতন্ত্র।
- অর্থাৎ সার্বিক শিক্ষা কাঠামোটি থাকবে — ১০ + ২ + ৩ + ২।

২। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ঃ

- এই স্তর প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব।
- এই স্তরের উন্নতিকল্পে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

- অবশ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ, বইপত্র ও অনুদান সরকারকে দিতে হবে এমন সুপারিশ করা হল।
- একটি করে রাজ্যস্তরের উন্নয়ন সংস্থা থাকতে হবে প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে।
- সরকারকে বিশেষ সক্রিয় হতে হবে শিক্ষকদের আদর্শ শিক্ষাদানের জন্যে।

৩। প্রাথমিক স্তর ঃ

প্রথম শ্রেণিতে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে মূলত ৬+ বছর বয়সে।

৪। নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাস্তর (প্রথম-চতুর্থ শ্রেণী) ঃ

- মাতৃভাষার ওপরেই শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হল এই স্তরে।
- প্রাথমিক গণিত ও প্রকৃতিপাঠ থাকবে ভাষার সঙ্গে।
- সমাজসেবার প্রতি গুরুত্ব দান করা হয়েছে।
- এই স্তরে শিশুদের কর্মপরিচিতির উদ্দেশ্যে মাটির কাজ, কাগজের কাজ, সুতো-কাটা প্রভৃতি কাজ পাঠ্যক্রমে অন্তর্গত করার জন্যে সুপারিশ জানানো হয়।
- নিম্নপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হবে অবৈতনিক।
- বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে '১ ম ও ২ য় শ্রেণি' এই দুবছর শেষ করে শেষে একটি পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে '৩-য় ও ৪-র্থ' শ্রেণিকেও এভাবেই একটি চক্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।
- নিম্নপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে যে বিষয়গুলি এই কমিশনে সুপারিশ জানানো হয়েছিল —

  ক) যেহেতু একটি ভাষা (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা),

  খ) গণিত,

  গ) সৃজনশীল কাজ,

  ঘ) পরিবেশ পরিচিতি,

  ঙ) স্বাস্থ্য শিক্ষা,

  চ) কর্ম অভিজ্ঞতা এবং সমাজসেবা।

৫। উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর (৫-ম — ৭-ম শ্রেণী) :

- মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পাঠ্যক্রম থাকবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি অথবা সহযোগী ভাষা ইংরেজী।
- তৃতীয় একটি অপর ভাষা ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়া যাবে।
- এই স্তরের পরীক্ষা হবে অভ্যন্তরীণ।

- এই স্তরে সমাজসেবা ও কর্মঅভিজ্ঞতার মত বিষয়গুলি রাখতে হবে।
- বিজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়গুলি ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় হিসেবেই পাঠ্যক্রমে অন্তর্গত হবে।
- ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে 'মিশ্রিত সমাজবিদ্যার' বদলে।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম :

ক) দুটি ভাষা থাকবে —

১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

২) হিন্দি বা ইংরেজী (তৃতীয় একটি ভাষা — 'ঐচ্ছিক')

খ) এছাড়াও যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকবে —

১) বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান)

২) গণিত

৩) সমাজসেবা ও কর্মঅভিজ্ঞতা

৪) শারীর শিক্ষা

৫) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

৬) কলা এবং

৭) সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান)

৬। মাধ্যমিক স্তর :

পরস্পরযুক্ত দুটি স্তরে কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়েছে —

ক) নিম্নমাধ্যমিক স্তর (৮ম—১০ম শ্রেণী) ঃ

- পাঠ্যক্রমে তিনটি ভাষা থাকবে। [মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় বা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং অপর একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।]
- আগের বিষয়গুলিও এই স্তরে গভীরভাবে পড়তে হবে।
- দশম শ্রেণীর পরে সাধারণ বহিঃপরীক্ষা হবে।
- গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হবে অবশ্যপাঠ্য।

এছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, কলা ও নৈতিক শিক্ষা, শারীরশিক্ষা ইত্যাদি পড়ানো হবে।

খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর :

- উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২ বছরের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে ঐচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেষীকরণের সূচনা। এছাড়াও, পূর্বের সাধারণধর্মী শিক্ষাকে গভীরভাবে পড়তে হবে।
- কৃষি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান-বিষয়ের সঙ্গে স্থান দেওয়া যাবে।
- পাঠ্যক্রমে ২টি ভাষা ও ৩টি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।
- মিশ্র-বিষয় নির্বাচন করা যাবে ঐচ্ছিক বিষয় নেওয়ার ক্ষেত্রে।
- এই স্তরের ২ বছরের শেষে বহিঃপরীক্ষা হবে এবং 'মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' শংসাপত্র দান করবে।
- বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে কলকারখানার আংশিক সময়ে, পলিটেকনিকে পূর্ণ সময়ে এবং স্যান্ডউইচ কোর্সের মাধ্যমে।
- শ্রম এবং সমাজসেবা শিবির থাকতে হবে।
- সংগীত, কলা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি ঐচ্ছিক বিষয় পাঠের সুযোগ পাবে নারীরাও।
- অনুমান করা যেতে পারে যে, নিম্নমাধ্যমিক উন্নীত ৫০% শিক্ষার্থী বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে থাকবে — যেকোন দুটি ভাষা, 'ঐচ্ছিক বিষয়' হিসেবে কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে যেকোন তিনটি বিষয় (যেমন — অতিরিক্ত ১টি ভাষা, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভূমিবিদ্যা ইত্যাদি), নৈতিক শিক্ষা, সমাজসেবা, কলা বা শিল্প, শারীর শিক্ষা ইত্যাদি।

৭। উচ্চশিক্ষা :

এ সম্পর্কে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি হল —

- শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।
- জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন।
- শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন।
- আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন।
- কতগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা।
- কতগুলি নির্বাচিত কলেজে ৩ বছরের বিশেষ ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে।
- অবশ্য প্রথম ডিগ্রি প্রাপ্তির শিক্ষাকাল ৩ বছরের কম হবে না এবং পরবর্তী ডিগ্রির সময় থাকবে ২ বা ৩ বছরের।
- কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত স্নাতক কোর্স চালু করা যেতে পারে।

- শিক্ষার মাধ্যম স্নাতক স্তরে থাকবে আঞ্চলিক ভাষা এবং স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজী।
- প্রয়োজনে গবেষক শিক্ষার্থীদের আংশিক অধ্যাপনার কাজে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- নতুন কোর্সের সঙ্গে প্রচলিত কোর্সের অবশ্যই যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে।
- প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার এবং ল্যাবরেটেরি গড়ে তোলার সৎ উদ্দেশ্যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িতে দিতে হবে।

৮। **বিবিধ :**

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও কতগুলি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কমিশন আলোকপাত করে।

ক) উচ্চশিক্ষাস্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি,

খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন,

গ) বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরাপত্তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা,

ঘ) 'বিদ্যালয়গুচ্ছের' (School Complex) মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির সদর্থক প্রয়াস,

ঙ) বহিঃপরীক্ষা তথা অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে কতগুলি সুপারিশ এবং

চ) প্রশাসনিক উন্নতিকল্পে কতগুলি ঘোষণা। অবশ্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় শ্রেণীর শিক্ষকেরাই একইরকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৪ জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) :

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১৯৮৫, জানুয়ারীতে এদেশীয় শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিষয়ক কতগুলি আলোচনার সূত্রে 'Challenge of Education — A Policy Perspective' নামে একটি শিক্ষানীতি বিষয়ক খসড়া প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬, মে মাসে CABE-এর অনুমোদন নিয়ে অবশেষে বিলটি সংসদের উভয় সভায় অনুমোদন পায়।

'বারোটি' অংশে বিভক্ত এই শিক্ষানীতি সংক্রান্ত দলিলে বেশ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে —

ক) শিক্ষাক্ষেত্রে 'বৈষম্য' বা 'অসমতা' দূরীকরণ।

খ) শিক্ষায় সকলের সমানাধিকার।

গ) তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষালাভের সমানাধিকার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়া।

ঘ) পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা এবং সার্বিক নির্বাচন (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সবক্ষেত্রেই)।

ঙ) নবোদয় বিদ্যালয়ে উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।

চ) বৃত্তিমুখী শিক্ষার সার্বিক কর্মসূচি রূপায়ণ।

ছ) 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকে 'জনমুখী' করে তোলার প্রচেষ্টা।

জ) এদেশীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া।

ঝ) বিভিন্নভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা।

ঞ) 'ত্রিভাষা' সূত্র প্রচলিত থাকা এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সচেতন ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

ট) চাকুরী সংক্রান্ত ডিগ্রীতে নমনীয়তা আনা।

ঠ) মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কারসাধন (যেমন - পরীক্ষা হবে নৈর্ব্যক্তিক, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নভিত্তিক, গ্রেড প্রথার প্রচলন, সেমিস্টারের প্রচলন, আধুনিক পদ্ধতিকরণ ইত্যাদি।)

২.৩.৫ প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (POA) ১৯৯২ :

১৯৬৮ সাল এবং ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিদ্বয়ের পরবর্তী অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল 'প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন' (১৯৯২) নামক একটি প্রয়োগ সংক্রান্ত দলিল। এই দলিলে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি প্রাধান্য পেয়েছে —

● **'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড** — যা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলি তুলে ধরা যেতে পারে।

ক) প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট পাকা বাড়ি।

খ) শিক্ষণ ও শিখন সংক্রান্ত যাবতীয় 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' শিখন সহায়ক উপকরণ (Teaching Learning Material) থাকতে হবে (যেমন- চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, ম্যাপ, চার্ট, চিত্র ইত্যাদি)।

গ) একজন মহিলা শিক্ষিকাসহ দুইজন শিক্ষক থাকবেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

ঘ) সমস্ত দেশে ৪৮ টি 'অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ' স্থাপনের জন্য ঘোষণা করা হয়, যার উদ্দেশ্য হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

ঙ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই সমস্ত কাজের জন্যে প্রারম্ভিক ব্যয় হবে ১ লক্ষ টাকা।

চ) শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যয়ভার বহন করতে হবে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডে'-র উদ্দেশ্যে।

জ) কম্পিউটার সরবরাহ করতে হবে আরো বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ে। তিনজন করে শিক্ষককে এ বিষয়ে সাক্ষর করে তুলতে হবে।

ঝ) উৎকর্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ঞ) এরই সঙ্গে প্রথামুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং বর্তমান কেন্দ্রগুলির উন্নতি ঘটাতে হবে।

ট) বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'দূর শিক্ষা'-র প্রসার ঘটাতে হবে (যেমন - দূরদর্শনে শিক্ষা চ্যানেলের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।)

ঠ) কতগুলি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভবিষ্যতের শিক্ষা-সংস্কারমূলক বিষয়গুলি এই ধরনের জাতীয় শিক্ষানীতিমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হলেও এই সমস্ত প্রচেষ্টাগুলি প্রায়শই 'আর্থিক সংকটের' কারণে ফলপ্রসূ হতে পারেনি। তবু 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' সংক্রান্ত ভাবনা বা প্রস্তাবগুলির প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

২.৪ সংক্ষিপ্তকরণ ঃ

- স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।
- প্রসঙ্গত রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরা গেল।
- মুদালিয়র কমিশনের সদস্যদের যাবতীয় সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করা হল।
- কোঠারী কমিশন সংক্রান্ত মূল্যায়ন নির্দেশগুলি আলোকপাত করা হল।
- জাতীয় শিক্ষানীতি (১৮৮৬) সম্পর্কিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হল।
- প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনের গুরুত্ব (১৯৯২) স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হল।

২.৫ অনুশীলনী ঃ

১। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতামত তুলে ধরুন।

২। পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

৩। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কোঠারী কমিশনের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

৪। 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' সম্পর্কে লিখুন।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

- হালদার, গৌরদাস (১৯৯৮), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা - ৯।
- ঘোষ, রণজিৎ (২০০০), আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৯।
- Rawat, P. L., History of Indian Education.
- Naik, J. P. and Nurullah, S., History of Education in India.

একক - ৩

স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ঃ

নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা।

ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত শিক্ষাগত মূল্য।

শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার (২০০৯)।

Constitutional Provisions regarding education in India :

Provisions for education in the Constitution of Independent India.

Educational values as reflected through the provisions of Indian Constitution.

Right of children to free & compulsory education (2009).

বিন্যাস

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ঃ

৩.৩.১ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানে শিক্ষার শর্তগুলি

৩.৩.২ ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত শিক্ষাগত মূল্য

৩.৩.৩ শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

৩.৪ সংক্ষিপ্তকরণ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা :

ভারতবর্ষের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। বেশ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতীয় সংবিধান অসাধারণ হয়ে উঠতে পেরেছে। অবশ্য ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলি দেশের সমস্ত অধিবাসী ভোগ করতে পারে না। কয়েকটি মৌলিক অধিকার (যেমন— চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, যাতায়াত ও বসবাস করার অধিকার, শিক্ষা তথা সংস্কৃতি সম্পর্কিত অধিকার ইত্যাদি।) শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ভোগ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১৯৪৯ সালের সংবিধানের বহু বিষয় ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে, ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর অবধি ৭১ বার সংবিধান সংশোধন করে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন আইন, যা ১৯৭৭-৭৮ সালের ৪৩ তম এবং ৪৪ তম সংশোধন দ্বারা মার্জিত হয়েছে— সেগুলি সত্যিই এদেশীয় সংবিধানকে অন্যতম গুরুত্ব দিয়েছে।

৩.২ উদ্দেশ্য :

- ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন নীতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া।
- শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানানো।
- মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা।
- প্রথাগত শিক্ষা এবং এই শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষার শর্তগুলি আলোকপাত করা।
- বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রগতির উদ্দেশ্যে সংবিধানের নমনীয় নীতিগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা এবং অপরকে জানানোর প্রচেষ্টা।
- এদেশীয় সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক অর্থে কতখানি সংবিধান নির্দেশিত এদেশের জাতীয় মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে নেওয়া।
- বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারের বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

৩.৩ স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ :

পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে 'নবনির্মিত ভারতীয় সংবিধান'। অবশ্য ১৯৪৯ সালের সংবিধানের বহু বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে। বলা যায়, এই পরিবর্তন হয়েছে ১৯৯২ সাল অবধি প্রায় একাত্তর (৭১) বার। ১৯৭৬ সালের '৪২ তম সংশোধন আইন' (যা ১৯৭৭-৭৮ সালেও সংশোধিত হয়েছে) বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৩.৩.১ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা :

যেকোনো প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেসমস্ত নীতিগুলি নির্দেশ করা হয়েছিল, সেগুলি হল—

ক) '৪৫ নং ধায়ায়' ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে বালক -বালিকারা যাতে ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

খ) সংবিধানের '৪৬ নং ধারায়' বলা হয়েছিল যে, অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের (বিশেষত তপশিলি, উপজাতিদের) সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা হবে এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রগতির জন্যে রাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

গ) '৩৫০-ক' ধারাতে প্রতিটি রাজ্য ও তাদের স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাকে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে নিজ-নিজ মাতৃভাষার শিক্ষার ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঘ) '৩৫১ ধারা'-তে হিন্দি ভাষার সম্প্রসারণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ নিতে বলা হয়।

ঙ) '৩৩৫ নং ধারা'-তে এবং পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে বিশেষত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের দাবিকে চাকরি নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবেচনা করার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়।

চ) ভারতীয় সংবিধানে বারংবার (২৯ এবং ৩০ নং ধারাতে এবং পরবর্তীকালে) 'সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক অধিকার' ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার ওপরে অনেকাংশে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরকে উৎসাহ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও এই ধরনের অধিকারে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির 'স্বার্থ সংরক্ষণের' ব্যাপারেও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হতে লক্ষ্য করা যায়।

- **স্বাধীন ভারতের সংবিধানে শিক্ষার শর্তগুলি :**

১৯৪৮ সালে রচিত সাংবিধানিক খসড়া ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর গণপরিষদে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয় এবং তা প্রবর্তিত হয় ১৯৫০, ২৬ শে জানুয়ারি থেকে। মোট ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত ও ১৩টি তফশিলের অন্তর্গত, ৩৯৫টি সৃষ্টির প্রায় ৪৫০টি ধারা সহ এই সংবিধানের অস্তিত্ব বর্তমান। এই ভারতীয় সংবিধানের আইন রচনার ক্ষমতা বন্টনের তিনটি তালিকা আছে। সেই তালিকাগুলি হল—

ক) কেন্দ্রীয় তালিকা (এক্ষেত্রে ৯৭টি বিষয়ের মধ্যে সাতটি বিষয় শিক্ষা সম্পর্কিত।)

খ) রাজ্য তালিকা (৬৬টি বিষয় আছে।)

গ) যুগ্ম তালিকা (৪৭টি বিষয় আছে।)

প্রথাগত শিক্ষার বিষয়টি সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ছিল, পরে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীতে যুগ্ম তালিকার ২৫ নং বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

এছাড়াও, সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় বিভিন্নভাবে শিক্ষার প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন কেন্দ্রীয় তালিকায় '৬২-৬৮' নং অনুচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার বিষয়গুলি এসেছে। রাজ্য তালিকায়

৩২নং ধারার [(i) ও (ii) উপধারায়] শিক্ষার প্রসঙ্গ এসেছে। যৌথ তালিকায় মোট ছয়টি বিষয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত (যেমন— ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৫০, ৩৫১ নং ধারা ইত্যাদি।)

১.৩.২ ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত শিক্ষাগত মূল্য :

- **মূল্যবোধ (Value) ঃ**

'Value' ইংরেজি শব্দটি লাতিন শব্দ 'Valerie' থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'Vigorous' এবং 'Strong'। আর 'Value' শব্দের থেকেই 'মূল্যবোধ' শব্দটিতে অর্থের দ্যোতনা দেওয়া হয়ে থাকে, যদিও আলোচ্য শব্দটি নৈতিকতা, মূল্য, ইচ্ছা, চাহিদা, আগ্রহ, আনন্দ, পছন্দ, কর্তব্য ইত্যাদি বহু বিষয়কে একত্রে বা খণ্ড-খণ্ড রূপে প্রকাশ করতে সক্ষম।

মহাত্মা গান্ধীর মতে, মূল্যবোধ হল এহেন প্রক্রিয়া যা আমাদের সকলের মধ্যে 'সত্যম, শিবম এবং সুন্দরমের' উপলব্ধি সন্নিবেশিত করে।

R. B. Perry এ সম্পর্কে বলেছেন — "Value is the relation of object to a valueing subjects."

- **মূল্যবোধের উৎসসমূহ (Sources of Value) ঃ**

বস্তুতপক্ষে, যে সমস্ত মূল্যবোধগুলি একটি জাতির নাগরিকদের জাতীয় জীবন ও তার ধারা, মানবতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বসমূহ এবং প্রয়োজনীয় আইনকানুন বা নীতিগুলি নির্বাচন করতে সক্ষম — তাদের একত্রে 'জাতীয় মূল্যবোধ' (National Value) বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কাজেই জাতীয় মূল্যবোধের এই ব্যাপক ধারণা কেবলমাত্র ভারতীয় সংবিধানে তুলে ধরা মূল্যবোধগুলির ধারণা উল্লেখ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু প্রায় সকল সমাজেই আদর্শ মূল্যবোধগুলি কতগুলি উৎস (Sources) থেকে গৃহীত হয়ে থাকে।

ক) যেকোনো দেশের সংবিধান,

খ) ধর্ম,

গ) ব্যক্তিত্ব,

ঘ) সংস্কৃতি,

ঙ) নৈতিকতা ইত্যাদি।

- **মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Value) ঃ**

ক) মূল্যবোধ একটি অর্জিত গুণ।

খ) প্রকৃতিতে মূল্যবোধ গতিশীল, কিন্তু এই মূল্যবোধ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হয় না।

গ) মূল্যবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে।

ঘ) ব্যক্তির প্রক্ষোভ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কযুক্ত।

ঙ) কতগুলি ক্ষেত্রে মূল্যবোধ সর্বজনীন হয়ে থাকে।

চ) সমগ্র বিশ্বের ভিন্ন-ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন মূল্যবোধের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ছ) বিশেষত সমাজ এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে।

জ) মূল্যবোধ ব্যক্তির রুচি, পছন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

● **প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও (৭নং তপশিলের ৩টি তালিকা) অন্যান্য শিক্ষা শর্তগুলির সাংবিধানিক শিক্ষাগত মূল্য আলোচনা করা হল —**

ক) **১৫ নং ধারার (i) নং উপধারা ঃ** ভারতীয় সংবিধানের এই উপধারায় [১৫ (i)] পুরুষ ও নারীর শিক্ষায় সমানাধিকারের প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শিশু মায়ের ওপরেই সার্বিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানেও একজন আদর্শ মা-কে প্রায় ১০০ জন শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের পাশেই নারীদের সমান মর্যাদা ও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

খ) **১৭ নং ধারা ঃ** জাত-পাত সংক্রান্ত কুসংস্কার দূরীকরণ হলে তবেই ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশগুলির মত আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হবে। তাই ১৭ নং ধারায় সংবিধানে ভারতীয়দের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদানের কথাও বলা হয়েছিল।

গ) **২৪ নং ধারা ঃ** ভারতবর্ষে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার একান্ত কাম্য। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই ১৪ বছরের নীচে যেসব শিশুর বয়স- তারা যেন প্রত্যেকেই শিক্ষার আলো দেখার সম্ভাবনা পায়। এই বিষয়ে সকল দেশবাসীকেই সচেতন হতে হবে এবং নিয়ম করে শিশুশ্রমিক প্রথা রোধ করতে হবে। সর্বোপরি, ২৪ নং ধারায় ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে ইতিবাচক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘ) **২৯ নং ধারা ঃ** ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মীয় ব্যাপারে সমস্ত সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে বিশেষত ২৯ নং ধারার অবতারণা করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সমস্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই ২৯ নং ধারাটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ঙ) **৩০ নং ধারা ঃ** ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে যদি কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান খুলতে চায়, সেক্ষেত্রে অনুদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাই এই ধরনের অনুদান প্রচলিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের ৩০ নং ধারা মহত্বের তথা উদারতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

চ) **৪১ নং ধারা ঃ** সকলের জন্যে শিক্ষার সমসুযোগ এবং সম-দায়িত্ব বন্টনের কথা ঘোষিত হয়েছে ৪১ নং ধারাতে।

ছ) **৪৫ নং ধারা ঃ** ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নং ধারার মাধ্যমে জনসাধারণের 'ন্যূনতম শিক্ষার দায়িত্ব' বন্টন করা হয়েছে রাষ্ট্রের ওপর।

জ) **৪৬ নং ধারা ঃ** ৪৬ নং ধারার মাধ্যমে 'আঞ্চলিক শ্রেণী বৈষম্য' দূর করার সদর্থক প্রচেষ্টা হয়েছে।

ঝ) **৪৯ নং ধারা ঃ** আলোচ্য ধারাটিকে আমাদের 'কৃষ্টিকে' সংরক্ষণের প্রসঙ্গ এবং 'সংস্কৃতিকে' আরো উন্নত করে তোলার প্রসঙ্গ দুটি আলোকপাত করা হয়েছে।

ঞ) **৩৩৭ নং ধারা ঃ** এই ধারায় শর্তসাপেক্ষে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে অনুদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে যে নতুন প্রজাতির জন্ম হবে তাদেরও গুরুত্ব দান করা হয়েছে।

ট) **(i) ৩৫০ নং ধারার (i) নং উপধারা ঃ** এই ধারায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনো অভিযোগ জানাতে গেলে ভারতবর্ষের যেকোনো ভাষাই প্রযোজ্য থাকবে।

(ii) ৩৫০ নং ধারার (ii) নং উপধারা ঃ বিশেষত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্যে রাষ্ট্রপতি একজন অফিসার রাখবেন, যিনি সমস্ত অভিযোগ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নিয়মিত সংসদকক্ষে পাঠাবেন এবং আশু সমাধানের ব্যবস্থা নেবেন।

ঠ) **৩৫১ নং ধারা ঃ** 'হিন্দি' ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অবশ্য কেন্দ্রের ওপর দায়িত্ব থাকবে 'হিন্দি ভাষার' উন্নতিসাধন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের।

● **ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত জাতীয় মূল্যবোধ (National Values in India Constitution) ঃ**

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি স্মরণ করলেই এর অন্তর্গত জাতীয় মূল্যবোধের ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

"We the people of India, Having solemnly resolved to constitute India into a Socialist Secular Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens.

Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship."..... etc.

সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষকে একটি সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে Article ১২-৩৫ -এ বর্ণিত হয়েছে প্রাথমিক অধিকার সম্বন্ধে, Articles ১৪-১৮-তে জাতীয় সংহতি এবং ১৯-২২ -এ নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে।

ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত প্রস্তাবনায় জাতীয় মূল্যবোধ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা আলোকপাত করা যেতে পারে —

ক) "We, the people of India"..... শব্দগুলি সাধারণ জাতীয় মূল্যবোধ রূপে ভারতীয়দের সার্বভৌমত্ব তথা একতা, সংহতি বা সহযোগিতার মত গুণগুলি প্রকাশ করে।

খ) "Socialist" – শব্দটির মাধ্যমে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি নাগরিককে একটি একক পরিবারের সদস্যরূপে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষকেও একটি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

গ) "Secular" – শব্দটির মাধ্যমে বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে প্রতিটি ধর্মের প্রতিই এক ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) "Sovereign" – শব্দটির দ্বারা ভারতবর্ষের 'সার্বভৌমত্ব' -কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাইরের কোন শাসক গোষ্ঠী যেন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিপূরক শক্তি হিসেবে হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঙ) "Democratic" – শব্দটির সাহায্যে ভারতীয় জনগণ সমন্বিত 'গণতান্ত্রিক' শাসন পরিকাঠামোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজে এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম তথা শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত প্রেক্ষাপটেই সদর্থক ও কার্যকরী থাকবে।

চ) "Republic" – শব্দটির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানে এদেশের সমস্ত নাগরিকদের 'প্রজাতন্ত্রের সাক্ষর' রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি নাগরিক ''We the people of India'' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই বর্তমান ভারতের সর্বোচ্চ পদাধিকারী 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী পদ্ধতি'-র মাধ্যমে সর্বসাধারণের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

ছ) "Justice" – শব্দটির দ্বারা ভারতবর্ষের ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েছে। সমগ্র রাজ্য এবং রাজ্যের জনগণের বিষয়ে যে সমস্ত দিক থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কতগুলি নমুনা হল —

- সামাজিক ন্যায়নীতি (Social Justice),
- অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি (Economic Justice),
- প্রশাসনিক ন্যায়নীতি (Administrative Justice),
- রাজনৈতিক ন্যায়নীতি (Political Justice) প্রভৃতি।

রাজনৈতিক ন্যায়নীতির অন্তর্গত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এইভাবে — ভোটাধিকার, সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, সরকার গঠনের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

জ) "Liberty" – শব্দটির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংবিধান নীতিগতভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে সরকার, প্রশাসন, ন্যায়-নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে নিজস্ব মতামত পোষণের স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের স্বাধীনতার কোনো অপব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) "Fraternity" – অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে এসেছে 'সৌভ্রাতৃত্ববোধের' মত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের মত মহান দেশে জাতীয় সংহতি এবং ঐক্যের ধারণাটি আলোকপাত করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই বিষয়গুলি এদেশীয় নাগরিকদের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

ঞ) ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ঃ

(১) ভারতীয় সংবিধানের Part-III, Article ১২-৩৫ -এ জনসাধারণের কয়েকটি মৌলিক অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে —

- শিক্ষার অধিকার,
- স্বাধীনতার অধিকার,

- জীবন সংক্রান্ত অধিকার,
- ভোট প্রদানের অধিকার,
- বাক্‌স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,
- নিজ-নিজ কর্ম ও সম্পদের অধিকার ইত্যাদি।

(২) 'Part-IV-A' -তে এই সংবিধানে কতগুলি নীতিগত বিষয়ে নির্দেশ দান করা হয়েছে —

- দেশের প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা,
- কর প্রদান,
- সরকারের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা,
- দেশীয় আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকা ইত্যাদি।

১.৩.৩ শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার :

ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি ব্যাপক অর্থে ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশিত জাতীয় মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। আর এই মূল্যবোধগুলি আমাদের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মূল্যবোধ বিভিন্নভাবে আলোকিত হওয়ার ফলেই বর্তমানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের '৪৫ নং ধারা' অনুযায়ী সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রকে ১৪ বছর বয়স অবধি সমস্ত শিশুকেই অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশের শিক্ষামূলক অগ্রগতির পথে এই ধরনের নিয়ম এক বিশেষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। সমস্ত আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে 'শিশুশিক্ষা' সংক্রান্ত এই নীতিটি সংবিধানে স্থানলাভ করেছে। যেকোনো সমাজে ভবিষ্যতের দিশারী শিশুরাই, তাই শিশুরা ঠিকমত শিক্ষালাভ না করলে যেকোনো দেশের সার্বিক প্রগতি ব্যাহত হবে। শিশুশ্রম এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতিক্রম করে শিশুদের অবৈতনিক ও ব্যধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের এই প্রচেষ্টা সত্যিই আশাবাচক, সুদূরপ্রসারী এবং প্রশংসনীয়।

৩.৪ সংক্ষিপ্তকরণ ঃ

- ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দান করা হল এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করা হল।
- বিশেষত শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।
- স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে শিক্ষার শর্তগুলি স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হল।
- ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত শিক্ষাগত মূল্য সম্পর্কে বলা হল।
- মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথাগত শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার শর্তগুলি আলোকপাত করা হল।

- ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত জাতীয় মূল্যবোধসমূহ বিশদভাবে তুলে ধরা হল।
- শিশুদের অবৈতনিক ও শিক্ষার বাধ্যতামূলক অধিকারের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।
- ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি ব্যাপক অর্থে কতখানি সংবিধান নির্দেশিত জাতীয় মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল তা আলোকপাত করা হল।

৩.৫ অনুশীলনী :

১। ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি এদেশীয় সংবিধান নির্দেশিত জাতীয় মূল্যবোধের ওপর কেন নির্ভরশীল?

২। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে শিক্ষা বিষয়ক শর্তগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি :

- Kochhar, S. K. (1981), Pivotal Issues in Indian Education.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯৫), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি।
- হালদার, গৌরদাস (১৯৯৮), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।
- Mukherjee, R. K., Ancient Indian Education.
- Rai, B. C., History of Indian Education, Prakashan Kendra, Aminabad, Lucknow.
- ঘোষ, রণজিৎ (২০০০), আধুনিক ভারতে শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৯।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, প: বঙ্গ।
- ঠাকুর, হক (২০০৯), আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা, রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩।

একক : ৪

একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

Education in 11th and 12th Five Years Plan

গঠন ❑ (Structure)

৪.১. সূচনা।

৪.২. উদ্দেশ্য।

৪.৩. একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০০৯-২০১২।

৪.৪. একাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ।

৪.৫. শিক্ষার ক্ষেত্রে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য।

৪.৬. একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা।

৪.৭. একাদশ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা।

৪.৮. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ।

৪.৯. শিক্ষাসংক্রান্ত একাদশ পরিকল্পনায় অর্থের সংস্থান।

৪.১০. একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ।

৪.১১. দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

৪.১২. দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

৪.১৩. সারসংক্ষেপ।

৪.১৪. প্রশ্নাবলী।

৪.১৬. উৎস (References)।

৪.১ ❑ সূচনা (Introduction) :

ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনীতি যে অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত পরিকল্পনার উপর যেগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে, ১৯৫১ সালে National Planing Commission গঠনের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রথম ৪ বছর বাৎসরিক বাজেটের উপর নির্ভর করে শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ঘটে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। Planing Commission-এর সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী হলেন একজন স্থায়ী সভ্য। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে রয়েছে বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ্, বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাবিদ ইত্যাদি। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা যুগ্মতালিকায় স্থান পাওয়ায়, শিক্ষা পরিকল্পনা কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুটি স্তরে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে Planing Commission এবং শিক্ষামন্ত্রক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। একাদশ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে ২০০৭ সালের মার্চ মাস থেকে। পরিকল্পনার শেষ সময় নির্ধারিত ২০১২ সালের মার্চ মাস। শিক্ষায় একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্য ন্যূনতম শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ সর্বজনীন করা। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমা ২০১২ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৩ সালের ৫ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদন পায়। এই পরিকল্পনায় প্রধানত অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশনে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেট আরো সমৃদ্ধ।

৪.২. ❑ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হবে —

(ক) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

(খ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন।

(গ) একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি জানতে পারবেন।

(ঘ) একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবেন।

(ঙ) একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৪.৩. ❑ একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০০৭-২০১২ (Education in 11th Five Years Plan 2007-2012)

ভারতবর্ষের অর্থনীতি আংশিকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সমস্ত পরিকল্পনার উপর যেগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনা যোজনা কমিশনের দ্বারা সম্প্রসারিত, সম্পাদিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৫১ সাল থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়নের ধারা আজ অবধি অব্যাহত আছে। এই পরিকল্পনাগুলি আগাম তৈরী রূপায়ণের দায়িত্বে পদাধিকার হিসাবে থাকেন Planing Commission। Planing Commission-এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার পর্যায়ে একজন সহসভাপতি থাকেন। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে নির্ধারিত

২০০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে, পরিকল্পনার শেষ সময় নির্ধারিত ২০১২ সালের মার্চ মাস। এই পরিকল্পনার বর্তমান সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী।

একাদশ পরিকল্পনাকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং Indian Education Plan বলে বর্ণনা করেছেন এবং সঙ্গে একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, জাতীয় আয়ের প্রায় ১৯% এই সময়ে কেবল শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। একথা তিনি ঘোষণা করেন ২০০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০তম সমাবর্তন সভায়। শিক্ষায় একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই গুরুত্ব অভিনব বলা যায়।

৪.৪. ❑ একাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

(i) আয় ও দারিদ্র্য (Income and Poverty) :

(ক) GDP (Gross Domestic Product)-এর বৃদ্ধির হারকে ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে দ্রুত হারে উন্নীত করতে হবে এবং দ্বাদশ পরিকল্পনায় এই ১০ শতাংশ বৃদ্ধিকে বজায় রাখতে হবে যাতে জনপ্রতি রোজগার ২০১৬-১৭-এর মধ্যে দ্বিগুণ হয়।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে GDP-এর হার ৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে বৃহত্তর লাভের প্রসার সুনিশ্চিত হয়।

(গ) নতুন করে ৭০ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষিত বেকারের হার ৫ শতাংশের নীচে কমাতে হবে।

(ঙ) অদক্ষ কর্মচারীদের মজুরী ২০ শতাংশ বাড়াতে হবে।

(ii) শিক্ষা (Education) :

(ক) প্রাথমিক থেকে Drop-out বা স্কুল ছুটের হার ৫২.২% (২০০৩-২০০৪) থেকে কমিয়ে নামিয়ে আনার (২০১১-২০১২) লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে।

(খ) প্রাথমিক অধীত বিদ্যার ন্যূনতম উন্নয়ন ঘটানো এবং গুণগত মানোন্নয়নের জন্য পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার কার্যকারিতাকে ফলপ্রসূ করা।

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের পার্থক্য-এর হার কমিয়ে ১০ শতাংশে আনতে হবে। অর্থাৎ ছেলেদের শিক্ষার হার ৭০% হলে মেয়েদের শিক্ষার যেন ৬০%-এর কম না হয়।

(ঘ) উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে হার বর্তমানে ১০ শতাংশ আছে তা এই পরিকল্পনার শেষে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।

(iii) স্বাস্থ্য (Health) :

(ক) শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে ২৮ এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে ১-এ আনতে হবে - প্রতি ১০০০ জন্ম পিছু।

(খ) ২০০৯-এর মধ্যে সকলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল জোগানো এবং সুনিশ্চিত করা যে, কেউ যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে না বঞ্চিত হয়।

(গ) ০-৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অনুষ্ঠিত হার বর্তমানে যা আছে তার অর্ধেক নামানো।

(ঘ) মহিলা এবং বালিকাদের মধ্যে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার হার পরিকল্পনাটির মেয়াদকালের মধ্যে ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(iv) মহিলা এবং শিশু (Women and Children) :

(ক) ০-৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রতি হাজার ছেলে পিছু মেয়েদের সংখ্যা ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে ৯৩৫ এবং ২০১৩-২০১৭-এর মধ্যে ৯৫০ করা।

(খ) সরকারী পরিকল্পনায় যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুমোদন দেওয়া হবে তার ৩৩% যাতে মহিলা ও শিশুরা পায় তা সুনিশ্চিত করা।

(গ) কোনো শিশুকে যাতে শিশু শ্রমিক হতে বাধ্য করা না হয় এবং সে যাতে নিরাপদ শৈশবজীবন উপভোগ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

(v) পরিকাঠামো (Infrastructure) :

(ক) ২০০৯ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী (BPL) মানুষদের ঘরে ঘরে যাতে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তা সুনিশ্চিত করা।

(খ) ২০০৯ সালের মধ্যে যে সমস্ত জায়গায় জনসংখ্যা ১০০০ বা তার বেশি সেগুলিকে সড়কপথের মাধ্যমে যুক্ত করতে হবে। (পাহাড়ি এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ক্ষেত্রে ৫০০) এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বসতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৫. ❑ শিক্ষার ক্ষেত্রে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ

(১) প্রথমেই দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত অসমাপ্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ।

(২) সারা দেশব্যাপী ৬-১৪ বছরের সমস্ত শিশুর নাম নথিভুক্তকরণ।

(৩) দেশের সাধারণ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মানের স্তরে আনা।

(৪) বিদ্যালয় শিক্ষার অষ্টম মান পর্যন্ত বিদ্যালয় ছুটের হার ৫২.২% থেকে ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে ২০% নামিয়ে আনা।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা।

(৬) বয়স্ক শিক্ষার হার ৮৫% নিয়ে যাওয়া।

(৭) উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার ১৫% নিয়ে যাওয়া।

(৮) সমাজে সমস্ত রকম বৈষম্য দূরীকরণ।

(৯) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা।

(১০) ২০০৯ সালের মধ্যে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা।

(১১) ভারতবর্ষে সমস্ত কেন্দ্র ও রাজ্যশাসিত অঞ্চলে NCERT নির্ধারিত গুণগত মান অনুসরণ করা।

(১২) Block Resource Centre (BRC) এবং Central Resource Center (CRC) স্থাপন করে শিক্ষার মানকে একই স্তরে নিয়ে যাওয়া। দশটি বিদ্যালয় মিলে হবে একটি CRC। প্রতি Block-এ যে কেন্দ্র থাকবে তার অধীন অন্তত ৫ জন Resource Teacher থাকবেন। তারা (CRC) থেকে উপযুক্ত শিক্ষণ গ্রহণ করে ব্লক স্তরে প্রত্যেক বিদ্যালয়কে শিক্ষাদান করবেন।

তিনি আরও বলেন সর্বশিক্ষা মিশনের মধ্য দিয়ে এই ভিতকে আরো মজবুত করা হয়েছে। দশম পরিকল্পনায় প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ পরিকল্পনাতেও বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে —

(ক) ২০০৩-২০০৪ সালে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া ৫২.২% ছাত্রদের হারকে ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে ২০%-তে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

(খ) ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা যেন সকলেই গ্রহণ করার সুযোগ পায় তা দেখতে হবে।

(গ) শিক্ষিতের হারকে অন্তত ৮৫%-তে নিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(ঙ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার ১৫% উন্নীত করতে হবে।

এই সময় লক্ষ্যপূরণের জন্য ইতিমধ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হল —

অর্থের যোগান :

কেন্দ্রীয় সরকার একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিক্ষা খাতে ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। যা পুরো পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের ১৯.৪%। এই খরচের ৫০% ব্যয় করা হবে সাক্ষরতা ও সর্বশিক্ষা মিশনের সাফল্যের লক্ষ্যে। ২০% মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে এবং বাকি ৩০% উচ্চশিক্ষা, কারিগরি বা অন্যান্য শিক্ষায় ব্যয় করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে এটা অত্যন্ত সুখবর যে সম্প্রতি সরকার ঘোষণা করেছেন যে, সারা দেশে প্রায় ৬০০০ বিদ্যালয় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৪.৬. ❑ একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা (Eleventh Plan Targets for Elementary Education)

(ক) ৬-১৪ বছর বয়স্ক সমস্ত শিশুদের (তাদের মধ্যে 'দিন আনি দিন খাই' পরিবারের শিশুরাও থাকবে) প্রাথমিকে ভর্তি করতে হবে।

(খ) CBSE অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের মান অর্জন করার চরম লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিকের গুণমানের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(গ) প্রাথমিক ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক সমস্ত রকম বৈষম্য ২০১১-১২ সালের মধ্যে দৃঢ় করতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক ভর্তির আগে ১ বছরের প্রাক্‌বিদ্যলয়ের শিক্ষা Pre School Education (PSE) চালু করতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক Drop-out বা স্কুল-ছুটের সমস্যা দূর করতে হবে এবং প্রাথমিকে Drop-out এর হার যেটা ৫০% এর ঊর্ধ্বে আছে তা কমিয়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ২০% নিয়ে আসতে হবে।

(চ) ২০০৮-২০০৯-এর মধ্যে সর্বজনীন MMS চালু করতে হবে।

(ছ) ২০১১-১২ সালের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক ICT-এর সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটাতে হবে (ICT – Information Communication Technology)

(জ) শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটাতে হবে শিক্ষার মৌখিক এবং পরিমাণগত মৌলিক দক্ষতার উপর জোর দিতে হবে।

(ঝ) সমস্ত EGS কেন্দ্রগুলিকে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করতে হবে।

(ঞ) সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে NCERT – Quality Monitoring Tools গ্রহণ করতে হবে।

৪.৭. ❑ একাদশ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা-লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ঃ

(১) একাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্য ন্যূনতম শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত করা এবং এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ সর্বজনীন করা।

(২) বিজ্ঞান, অঙ্ক ও ইংরেজী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চমানে উন্নীত করা।

(৩) ভর্তি, ড্রপ আউট ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ধরে রাখার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে।

এছাড়া প্রতি জনবসতির ৫ কিমি-র মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭-৮ কিমির মধ্যে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। মাধ্যমিক শিক্ষায় GER মোট অন্তর্ভুক্তিকরণ বা ভর্তির হার যা ২০০৪-০৫ নাগাদ ছিল ৫২% তা বাড়িয়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ১৫%-এ নিয়ে যেতে হবে। Combined Secondary ও Senior Secondary ক্ষেত্রে GER (GER – Gross Enrolment Ratio) ৪০% থেকে বাড়িয়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ৬৫%-এ নিয়ে যেতে হবে।

৪.৮. ❑ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রম তৈরী ২০০৫ নীতি গ্রহণ বা (NCF – National Curriculum Framework), NET/SET পরীক্ষা গ্রহণ এবং NCERT, CBSE, SCSE, SCERT এবং বিভিন্ন রাজ্য বোর্ডের মতো প্রশাসনিক সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি কার্যকর হলে উন্নতমানের অধ্যাপকবর্গ বা শিক্ষক নিযুক্তিকরণ, বিদ্যালয় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী অমীমাংসিত প্রতিষ্ঠানিক সমস্যার সংস্কার সাধন এবং সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবদান বা কৈফিয়ত প্রদানের সুনিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হবে।

বিদ্যালয়ে তথ্য আদান প্রযুক্তির পুর্নগঠন I.C.T. (Information Communication Technology) :

একাদশতম পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত 'সেকেন্ডারী' ও 'Senior Secondary' বিদ্যালয়গুলিতে ICT পরিকাঠামো স্থাপন করতে হবে। প্রায় ৮০,০০০ বিদ্যালয়কে ইন্টারনেটে/ Wireless Broadband Mode-এর মাধ্যমে যুক্ত করার প্রস্তাবে এবং বাকি ২৮,০০০ বিদ্যালয়কে অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিদ্যালয়ে ফার্ম কর্মের বিভিন্ন ভাগে Terminal Broadband-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করার প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

নারী শিক্ষা :

(ক) সামগ্রিক শিক্ষায় উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হল নারী সমাজ। অথচ দেখা যাচ্ছে এখনও সারা দেশে নারী ও বিদ্যালয় ছুট (Drop-out) নারীর সংখ্যা সমগ্র সংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ। তাই একাদশ পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার পুরানো সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, যাতে সমাহার-এ তাদের বিদ্যালয়ে আনা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে- এই লক্ষ্য পূরণে ইতিমধ্যে অষ্টম মান পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সমস্ত মেয়েদের বিনা পয়সায় পাঠ্যপুস্তক দান করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

(খ) শিশুশ্রম আইনকে আরো কঠোর করা হয়েছে। শিক্ষকেরা যাতে স্থানীয় এলাকায় পিছিয়ে পড়া মেয়েদের বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আনতে সক্ষম হয়, তার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

(গ) খেলাধূলা অথবা অন্যভাবে যাতে শিক্ষার আঙিনায় মেয়েদের আনা যায়, তার জন্য মা-মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে ছাত্রী আবাসনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ :

তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন না হয়, সেজন্য একাদশতম পরিকল্পনায় যেসব বিশেষ দিকগুলির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল —

(১) বিশেষ সামাজিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে।

(২) বিনামূল্যে ওই সমস্ত বিদ্যালয়ে স্কুল ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক এবং মধ্যাহ্নকালীন খাদ্য সরবরাহ করা হবে।

(৩) ছেলেমেয়েদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) যোগ্য শিশু বা শিক্ষার্থীকে স্টাইপেন্ড দিতে হবে।

(৫) রাজ্য সরকারের সাধারণ পাঠ্যক্রম চালু বা গ্রহণ করার জন্য সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে সাহায্য করা হবে।

(৬) প্রাক্‌মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকোত্তর স্কলারশিপ চালু করতে হবে।

(৭) দুর্বল বা নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে বা বিদ্যালয়ের বাইরে বিশেষ সংশোধনমূলক কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) উপরিউক্ত বিষয়গুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য এলাকার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher's Education) :

শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়নের উদ্দেশে NCTE-এর নিয়মকানুনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে এপর্যন্ত ৫৭১ টি DIET (District Institute of Education and Training) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। DRC (District Research Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যে ১০০ টি NCTE-র অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং ৩১টি (Institute of Advance Study in Education) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৬-২০০৭-এর মধ্যেই এগুলির বাস্তবায়ন ঘটেছে।

বৃত্তিশিক্ষা-একাদশ পরিকল্পনায় কৌশল এবং লক্ষ্য (Voactional Education - Strategy and targets in the 11th plan) :

নিযুক্ত কর্মচারী বা চাকুরীজীবীদের সঙ্গে নিয়ে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর উপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে যে কার্যক্রম চালু আছে তার পুনর্বিন্যাস ঘটানোর জন্য হাতেকলমে শিখন, উচ্চমানের গতিশীল ও নমনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা (Technical Education in Higher Education) :

ভর্তি, পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন —

(ক) সকল শিক্ষার্থীকে Common Entrance দিতে হবে অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালগুলিতে চাকুরীমুখী কোর্স এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই উপযুক্ত যোগ্যতা মানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(খ) সেমিস্টার পদ্ধতিকে সর্বজনীন করতে হবে।

(গ) বার্ষিক একবার পরীক্ষার বদলে প্রতিনিয়ত অন্তঃমূল্যায়ন এবং অন্তঃপরীক্ষার নিয়ম চালু করতে হবে।

(ঘ) প্রতি ৩ বছর অন্তর পাঠ্যক্রম ব্যবস্থার সংশোধন করা দরকার। কাজের বাজারের তাগিদ এবং গবেষণামুখীকরণের লক্ষ্যে হওয়া দরকার।

নির্ণায়ক ও সূচক নির্ধারণ (Accreditation and Ratings) :

(১) সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ণায়ক ও সূচক পদ্ধতি চালু করতে হবে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক সূচক ছাড়াও বিভাগ অনুযায়ী সূচক যোগ করতে হবে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং প্রেষণা (Teacher's Competence and motivation) :

NET অথবা SET ব্যবস্থাই হবে পর্যাপ্ত ও ভালো শিক্ষক নিয়োগের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

বিবিধ ভাবনা (Miscellaneous) :

উচ্চশিক্ষায় বিশেষধর্মী গবেষণার জন্য একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র গঠন করতে হবে।

৪.৯. ❑ শিক্ষা সংক্রান্ত একাদশ পরিকল্পনায় অর্থের সংস্থান (Financing Education in the 11the Plan)

একাদশ পরিকল্পনায় সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে GDP-র ৬% অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান মূল্যের ভিত্তি অনুযায়ী ২-৭০ লক্ষ কোটি ব্যয়ের কথা বলেছিলেন যা পরিকল্পনার থেকে (২০০৬-০৭ মূল্য অনুযায়ী যা ছিল ২.৩৭ লক্ষ কোটি) প্রায় চারগুণ বেশী। সমগ্র পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার বৃদ্ধি হল ৭.৭% থেকে ১৯.৪% শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার (প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষাসহ) আর্থিক ব্যয় যথাক্রমে ২০% এবং ৩০% হবে।

পরিবেশ ভাবনা (Environment) :

(১) বনসৃজন ও বৃক্ষরোপণ ৫% হারে বাড়াতে হবে।

(২) ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে World Health Organisation-এর মান অনুযায়ী প্রধান শহরগুলির স্বাস্থ্য পরিসেবা স্থির করতে হবে।

(৩) ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে শহরের অপচয়কৃত জলের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

(৪) ২০১৬-২০২০ সালের ভিতরে ২০ শতাংশ শক্তির কার্যকারিতা (energy efficiency) বাড়াতে হবে।

৪.১০. ❑ একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ :

উপার্জন এবং দারিদ্র্য :

(ক) মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়িয়ে ৮ শতাংশ নিয়ে যেতে হবে এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই ১০ শতাংশ বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে হবে; যাতে ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ মাথাপিছু উপার্জন দ্বিগুণ করা যায়।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে GDP বৃদ্ধি হার বাড়িয়ে বার্ষিক ৪ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। উন্নয়নের সুফল যাতে আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়— তা নিশ্চিত করতেই বৃদ্ধির হারকে এই পর্যায়ে নিতে যেতে হবে।

(গ) ৭ কোটি নতুন কর্মসংস্থার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনতে হবে।

(ঙ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে আনতে হবে।

শিক্ষা :

(ক) একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলগুলি থেকে স্কুল ছুটের হার ২০০৩-০৪ সালের ৫২.২ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২০১১-১২ সাল নাগাদ ২০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা এবং নিয়মিত মূল্যায়ন ও নজরদারির মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখার চেষ্টা।

(গ) সাত বা তার বেশী বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে ৮৫ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) সাক্ষরতার ক্ষেত্রে 'জেন্ডার গ্যাপ' ১০ শতাংশ পয়েন্টে নামিয়ে আনতে হবে।

(ঙ) একাদশ পরিকল্পনার শেষে উচ্চশিক্ষা পাঠ নিতে যাচ্ছে এরকম ছাত্রের সংখ্যা দেশের মোট ছাত্রসংখ্যার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা।

স্বাস্থ্য :

(ক) প্রতি হাজার শিশুর জন্মপিছু শিশু মৃত্যুর হার (IMR) কমিয়ে ২৮-এ এবং প্রসূতি মৃত্যুহার কমিয়ে ১-এ নিয়ে যেতে হবে।

(খ) মোট উর্বরতার হার কমিয়ে ২.১-এ নিয়ে যেতে হবে।

(গ) ২০০৯ সাল নাগাদ দেশের সব নাগরিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) সদ্যোজাত থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত যত সংখ্যক শিশু বর্তমানে অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদের সংখ্যাটি কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে যেতে হবে।

(ঙ) প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও কন্যাসন্তানদের মধ্যে রক্তাল্পতার ঘটনা একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্বে পৌঁছে ৫০ শতাংশ কমাতে হবে।

মহিলা ও শিশু :

(ক) সদ্যোজাত থেকে ৬ বছর বয়ঃসীমার শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত বাড়িয়ে ২০১১-১২ সাল নাগাদ ৯৩৫ এবং ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ ৯৫০-এ নিয়ে যেতে হবে।

(খ) যাবতীয় সরকারী প্রকল্প থেকে সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষভাবে যত সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে অন্তত ৩৩ শতাংশ যাতে মহিলা বা বালিকা থাকেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিকাঠামো :

(ক) ২০০৯ সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি গ্রাম এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। এই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একাদশ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) ২০০৯ সাল নাগাদ দেশে হাজার বা তার বেশি সংখ্যক (পাহাড়ি ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা অঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫০০) মানুষের বাস এমন জনবসতিগুলিতে সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে এবং ২০১৫ সাল নাগাদ দেশের মোটের উপর সব জনবসতিতেই এ ধরনের সড়কপথের পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামকে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এবং ২০১২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে 'ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি' পৌঁছে দিতে হবে।

(ঘ) ২০১২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গৃহনির্মাণের জায়গা দিতে হবে এবং ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে সমস্ত গরিব মানুষ যাতে নিজস্ব গৃহে বাস করতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

পরিবেশ :

(ক) দেশে বৃক্ষ ও অরণ্য আচ্ছাদনের পরিমাণ ৫ শতাংশ পয়েন্ট বাড়াতে হবে।

(খ) ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত মুখ্য শহরে বাতাসের গুণমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেওয়া মাত্রায় সমমানে নিয়ে যেতে হবে।

(গ) নদীর জলকে নির্মূল করে তুলতে ২০১১-১২ সালের মধ্যে সমস্ত শহরে বর্জ্য/নিকাশি জল পরিশোধনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঘ) ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে শক্তি কার্যকারিতা (Energy efficiency) ২০ শতাংশ পয়েন্ট বাড়াতে হবে।

৪.১১. ❑ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-২০১২-২০১৭ (Education in 12th Five Year Plan) :

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১২-১৭) খসড়ায় বৃদ্ধির হার (growth rate) লক্ষ্য মাত্রা, রাখা হয়েছিল ৯.৫৬%।

প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বৈশ্বক পরিস্থিতিতে বলেছেন যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ৯% গড় বৃদ্ধির হার অর্জন করা সম্ভব নয়। নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সভায় চূড়ান্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯% রাখা হয়েছে।

''এটা ৯ শতাংশের গড়ে মনে করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ৮% এবং ৮.৫%-এর মধ্যে হওয়া উচিত '' আলুওয়ালিয়া রাজ্য প্লানিং বোর্ড এবং বিভাগে sideliness সম্মেলনে জানিয়েছেন, The approached paper for the 12th plan, approved last year took about an annual average growth rate of 9 %.

ভারত সরকারের ইচ্ছা দারিদ্র্যতা ১০% কমানো দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পায়। Mr. Ahluwallia বলেছেন, ''আমরা পরিকল্পনা সময়কালে বার্ষিক শতকরা হারে অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে দারিদ্র্যতা কমানোর লক্ষ্য মাত্রা রেখেছি''। তেন্ডুলকর পদ্ধতি অনুযায়ী, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার ২০০৯-২০১০-এর শেষে ছিল শতকরা ২৯.৮। এই সংখ্যা গ্রামঞ্চলে শতকরা ৩৩.৮ শতাংশ ছিল এবং শহরাঞ্চলে ২০.৯ শতাংশ ছিল।

12th Five Year Plan (2012-2017) Overview and Highlights :

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১২ সালের ৫ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদন পায়। যার গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক ৮.২ বৃদ্ধি শতাংশ এবং প্রধানত Thrust অঞ্চলগুলিতে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশনে বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধির হার (growth rate) প্রতিকূলীয় ও শতাংশ থেকে ৮.২ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১২-২০১৭)। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ছিল ৭.৯ শতাংশ।

A full planning commission chaired by Prime Minister Monmohan Singh on September 15 endorsed the documents which has fixed the total plan size at Rs. 47.7 lakh crore.

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৪ শতাংশ হারে অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। 12th Plan সময়কে বলা হয় ''Critical to achieve inclusive growth''.

Highlights of 12th Five Year Plan (2012-2017) :

(ক) গড় বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশে রাখা হয়েছে।

(খ) প্রধান Thrust অঞ্চলগুলিতে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(গ) বৃদ্ধির হার প্রতিকূলীয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে অভিক্ষিপ্ত ৯ শতাংশ থেকে ৮.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

(ঘ) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৯ %.

(ঙ) A full Planing Commission chaired by Prime Minister Monmohan Singh on September 15 endorsed the document which has fixed the total plan size at Rs. 47.7 lakh crore.

(চ) দ্বাদশ পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৪ শতাংশে হারে অর্জন লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

(ছ) দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে ২.৪ ছিল, বর্তমান পরিকল্পনায় তার তুলনায় ৩.৩ শতাংশ-এ আনা হয়েছে। উৎপাদন খাতের জন্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

(জ) দারিদ্র্যতা ১০ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৩০% দারিদ্র্য।

(ঝ) কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান Montek Singh Ahluwalia, Thrust অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই জন্য পরিকল্পনায় outlays উত্থাপিত হয়েছে ওইসব এলাকায়।

(ঞ) কমিশন গ্রহণ করেছে অর্থমন্ত্রী P. Chidambaram-এর মতামত সরাসরি নগদ টাকা স্থানান্তর খাদ্যে ভর্তুকিকরণ, সার এবং খনিজ দ্রব্যে ভর্তুকিকরণ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে।

(ট) কৃষি (Agriculture) : বর্তমান দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিতে বৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ, যেখানে দশম পরিকল্পনায় তুলনায় ছিল ২.৪ শতাংশ। উৎপাদন খাতের জন্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১০ শতাংশ।

(ঠ) পরিকাঠামো (Infrastructure) : পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর চাপের মধ্যেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতের জন্য; (Power Sector) উচ্চবৃদ্ধি এবং ইনক্লুসিভনেসের জন্য Bottlenecks অপসারণে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণে, শিশু মৃত্যুর হার কমাতে, তালিকাভুক্তির অনুপাত (enrolement ratio) এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে (Job Creation).

(ড) দারিদ্র্যতা (Poverty) : দারিদ্র্য দূরীকরণে কমিশন লক্ষ্যমাত্রা রেখেই এই পরিকল্পনার শেষে (12th Plan) ১০% কমাতে। প্রত্যেক বছর ২% হারে দারিদ্র্যতা কমাতে ২০১৭-এর শেষে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা (Health and Education) :

প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ার পারসন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার মতে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে Thrust Area (খোঁচা এলাকাগুলিতে) বিশেষ নজর দিতে হবে এবং পরিকল্পনা এর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে।

স্বাস্থ্যের উপর ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিশেষ পদক্ষেপ উত্থাপন করা হয়েছে। এর সঙ্গে পানীয় জল এবং স্যানিটেশনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধির খরচ ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্লানিং কমিশন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছে— সরাসরি নগদ টাকার স্থানান্তর (Direct Cash Transfer), খাদ্যে ভর্তুকীকরণ, সারে ভর্তুকীকরণ, খনিজ দ্রব্যে ভর্তুকীকরণ দ্বাদশ পরিকল্পনায় যা করতে হবে।

12th Five Year Plan (2012-2017) Objectives :

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৪ঠা অক্টোবর ২০১২ ইউনিয়ন মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদন পেয়েছে। এর লক্ষ্য ভারতের অর্থনীতির পুনর্জীবন ঘটানো, শিশু, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যের সুবিধা, উন্নতিতে সহায়তা করা। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনার বাজেট আরও সমৃদ্ধ, এই পরিকল্পনার বিশাল বাজেট সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪৭,৭০,০০০ লক্ষ কোটি টাকা, যেটা গড়ে স্তরে ৮.২ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সাধন করতে সমর্থ হবে।

12th Five Year Plan (2012-2017) Objectives :

পরিকল্পনার লক্ষ্য সমস্ত ধরনের bottlenecks এড়ানো এবং জাতির কাঠামোগত প্রকল্পের মানোন্নয়ন। প্লানিং কমিশনের উত্থাপনে লক্ষ্য (দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়) সরকারের ভর্তুকি বোঝা GDP-এর (Gross Domestic Products) ২ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশে কমানো নিশ্চিতকরণ এবং এই পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ যা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধিতে মার্কিন US$1 ট্রিলিয়ন লক্ষ্য মাত্রা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনায় ভর্তুকিরত UID (Unique Identification Number) কাজ করবে প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নগদ টাকা স্থানান্তরকরণে (Cash transfer).

12th পরিকল্পনার লক্ষ্য কৃষিতে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন এবং ১০ শতাংশ দারিদ্রতা কমানো ২০১৭-এর মধ্যে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (NDC) বোর্ডে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে পরিকল্পনা প্রণয়নের খসড়া উপস্থাপন করা হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছিল।

৪.১২. ❑ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য (The Aims of the 12th Five Year Plan)

দ্রুত, টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ বৃদ্ধি (Faster, Sustainable and more inclusive) :

ভারত সরকার প্রবর্তন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে একটি পরিকাঠামোগত প্রক্রিয়ায় দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার Approach Paper প্রস্তুতির জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় যারা সমাজের সুশীলসমাজের ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতা, NGO -তে জড়িত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা সুপরামর্শ হিসাবে নিতে চেয়েছেন। চিহ্নিত এলাকায় বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জ এবং আলোকপাত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার 12th Plan-এর খসড়া Approach Paper-গুলিকে মুক্ত করেছে NDC মিটিং-এ আলোচনা করার জন্য। An overall growth target of 9% is envisaged by the Govt. for the 12th. Plan with sectoral targets for Agriculture, Industry and Service Sectors

as 4%, 9.6% and 10% respectively with probable inflation ranging some where between 4.5% and 5% for the plan period.

রাজ্য কৃষিতে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভর্তুকি প্রদান, ঋণের উপর আগ্রহ প্রদান এবং অন্যান্য ইনপুটের উপর সুদ প্রদানকরণ। রাজ্য বড়সড় বিনিয়োগ করছে সেচের জন্য। পানীয় জলের সংরক্ষণের জন্য এবং পানীয় কলের উন্নয়নের জন্য। পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে পুনর্বিন্যাসমূলক নীতির সুযোগ এবং বৃদ্ধির একটি নতুন দৃষ্টি অর্জন নীতি বিস্তৃত হবে দ্রুত; এটা প্রদান করবে একটা সুযোগ যেটা অবিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ। রাজ্যে লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্ম সংস্থান বাড়বে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কমানো এবং দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার চিহ্নিত কোর সেক্টর যেমন পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃষি, Liver Stock মৎস্য, Horticulture (পশুসম্পদ), শিল্প, IT, পর্যটন ইত্যাদি। যুবকল্যাণ এবং সংখ্যালঘু কল্যাণের জন্য দ্বাদশ পরিকল্পনার প্রথম বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১২-১৩ উত্থাপন করা হয়েছে। 12th Plan সময়কালে মনোযোগ আকর্ষণকারী এলাকায় এইসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যকর করা হবে বেশি মাত্রায়।

ফলাফল ফ্রেমওয়ার্ক মডেল, রাজ্য সরকারের একটি বিভাগ আর্থিক বছরে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করার আশা রাখে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপলব্ধ করা হয়ে ভারত সরকারের লাইন নেভিগেশনের ফলে ফ্রেমওয়ার্ক যেটা নব্য নেভিগেশন খুঁজে কাজ করছে। এই নথির দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে —

(১) পদ্ধতি থেকে বিভাগের ফোকাস সরানো-ফলাফলের অভিযোজক স্থিতিবিন্যাস।

(২) 11th Plan-এর বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মূল্যায়নের উদ্দেশ্য এবং ন্যায্য ভিত্তিতে Inclusiveness-এর জন্য প্রাসঙ্গিক প্রদত্ত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উচ্চাহার আরও বিস্তার ঘটানো।

বৃদ্ধি দৃষ্টি (Growth vision) :

আর্থিক শৃঙ্খলার সঙ্গে শক্তিশালী কয়েকটি কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত কয়েক বছর সময় অর্জন অভিজ্ঞতার সঙ্গে কৃষিতে ৬% সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র বিশেষে এবং বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা 12th Plan-এ সময়কালে ১০% করা হয়েছে। শিল্পের জন্য ১০.৫% এবং পরিবেশগুলির জন্য ১১.৫%। কার্যকরভাবে জনসংখ্যাভিত্তিক লভ্যাংশ বৃদ্ধি এবং শ্রমভিত্তিক লভ্যাংশ বৃদ্ধি একটি মাত্রা পাবে। রাজ্য সরকারের দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ Thrust area গুলিতে বৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে। ওইসব এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। Thrust area-গুলিতে (১) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন অনেক উচ্চমাত্রা অর্জিত করা আবশ্যক। এছাড়াও (২) চাহিদা পূরণের জন্য ভালো মানের চাকরি, জীবিকা অর্জনের সুযোগ বিস্তৃতি ঘটানো, অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন সৃষ্টিকারী পরিবেশ, রাজ্যে সম্পূর্ণ যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ ঘটানো।

৪.১৩ ❑ সারসংক্ষেপ (Summing Up)

ভারতবর্ষের অর্থনীতি আংশিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেই সমস্ত পরিকল্পনার উপর যেগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনা যোজনা কমিশনের দ্বারা সম্প্রসারিত, সম্পাদিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। একাদশ পরিকল্পনা লক্ষ্যগুলি হল — (ক) আয় ও দারিদ্র্য, (খ) শিক্ষা, (গ) স্বাস্থ্য এবং (iv) মহিলা ও শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। এই পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখানে শিশুশ্রম আইনকেও আরোও কঠোর করা হয়েছে। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যন্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষণ-এর মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে NCTE-এর নিয়মকানুনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও তাদের প্রভূত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত একাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ যথেষ্ট বেড়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১২ সালে 5th অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদন পেয়েছিল। এই দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং স্যানিটেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষিতে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভর্তুকি প্রদান, ঋণের উপর আগ্রহ প্রদান এবং অন্যান্য ইনপুটের উপর সুদ প্রদানকরণ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে পুনর্বিন্যাসমূলক নীতির সুযোগ এবং বৃদ্ধির। রাজ্যে লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কমানো ও দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্যমাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতির পুনর্জীবন ঘটানো এবং সার্বিক উন্নতিতে সহায়তা করা। এই পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ যা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধিতে US$1 ট্রিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেট আরো সমৃদ্ধ।

৪.১৪. ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্ধারিত সময় উল্লেখ করুন।

(২) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সভাপতি ও সহসভাপতির নাম কী?

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সভাপতি ও সহসভাপতির নাম কী?

(৪) ICT পুরো কথাটি কী?

(৫) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কী কী লক্ষ্য ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করুন।

(৪) সামাজিক বৈষম্যদূরীকরণে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পদক্ষেপগুলি বিবৃত করুন।

(৫) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(২) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪.১৫. ❑ উৎস (References) :

(1) Agarwal J.C. (2005) - Recent Development and change in Education.

(2) Banerjee S.H. - History of Education in India.

(3) Chakraborty S.C. - Modern Indian Education.

(4) আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা - ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, শেখ হামিদুল হক।

(5) সাম্প্রতিককালীন ভারতীয় শিক্ষার ধারা -ড. দেবাশিষ পাল, ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, হামিদুল হক।

(6) ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা - সরোজ চট্টোপাধ্যায়।

একক : ৫

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অফ ইউনেস্কো - ২০০০
(Global Monitoring report of UNESCO - 2000)

গঠন : (Structure)

৫.১ : সূচনা

৫.২ : উদ্দেশ্য

৫.৩ : গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের লক্ষ্য সমূহ

৫.৪ : একবিংশ শতকের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন
(International commission for 21 st century)

৫.৫ : জাতীয় মেধা আয়োগ
(National Knowledge commission)

৫.৬ : সারসংক্ষেপ

৫.৭ : প্রশ্নাবলী

৫.৮ : উৎস
(References)

৫.১ ❑ সূচনা (Introduction) :

শিক্ষার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীর ১৬৪টি দেশ একত্রে যে বিষয়ে সহমত হয়, তাহল গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০০ সালে ৬টি মূল লক্ষ্যের অবতারণা করে। প্রত্যেকটি শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সারা বিশ্বে ১০০ কোটি শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ মেয়ে রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য বিশ্ব জুড়ে সকলের জন্য যে শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়া হয় সে কর্মসূচী বাস্তবে কতটা ফলপ্রসু হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য UNESCO কতকগুলি স্বাধীন দল গঠন করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেই স্বাধীন দলগুলি শিক্ষার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করে তারা UNESCO -র কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। পরবর্তীকালে সেই বি. পার্ট Global Monitoring Report নামে প্রকাশ করে।

৫.২ ❑ উদ্দেশ্য :

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিহিত হবেন।

(ক) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

(খ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে জানবেন।

(গ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকগুলি জানতে পারবেন।

(ঘ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে যে যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

(ঙ) আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন ও নলেজ কমিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর ১৬৪টি দেশ একত্রে যে বিষয়ে সহমত হয়, তাই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট। এই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের মূল লক্ষ্যই ছিল সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫.৩ ❑ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের লক্ষ্য সমূহ ঃ

শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ-এ এই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০০ সালে ৬টি মূল লক্ষ্যের অবতারণা করে।

(১) **শৈশব শিক্ষার উন্নয়ন এবং যত্নবান হওয়া ঃ** শৈশবে শিশুশিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো খুবই জরুরি। তাই শিশুশিক্ষার্থীর প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(২) **2015 সালের মধ্যে সকল শিশুকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসা ঃ** সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 2015 সালের লক্ষ্যমাত্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান হবে উন্নতমানের।

(৩) **জীবনশৈলী বৃত্তিমূলক/কর্মমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ ঃ** প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে জীবনশৈলী শিক্ষাদানে গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন দেশ জীবনশৈলীর পাঠদানের জন্য বিভিন্ন উন্নত কৌশল প্রয়োগ করছে। জীবনশৈলী শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বৃত্তিমূলক, কর্মমূলক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৪) **2015 সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার 50 শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ঃ** 2015 সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার অন্তত 50 শতাংশ উন্নয়ন ঘটানো দরকার। যায় মধ্যে মহিলাদের বিশের গুরুত্বের সঙ্গে এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। মহিলা বয়স্কদের চলমান শিক্ষার পথে নিয়ে আনতে হবে।

(৫) **2015 সালের মধ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে ঃ** 2015 সালের মধ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে এবং 2015 সালের মধ্যে এই সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে শৈশব থেকেই প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ করে দিতে হবে।

(৬) **শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে ঃ** UNESCO -র মতে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে সেক্ষেত্রে উন্নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার

জন্য শিক্ষার্থীর অক্ষর জ্ঞানের পরিচয়রে পাশাপাশি গণিত শিক্ষার এবং প্রয়োজনীয় জীবনশৈলীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বাধাতামূলক করার কথা ভাবতে হবে।

❑ UNESCO -র ভূমিকা ঃ

বিশ্বজুড়ে সকলের জন্য যে কর্মসূচি নেওয়া হয় সে কর্মসূচি বাস্তবে কতটা ফলপ্রসু হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য UNESCO কতকগুলি স্বাধীন দল গঠন করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেই স্বাধীন দলগুলি শিক্ষার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করে এবং তারা UNESCO -র কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। পরবর্তীকালে UNESCO সেই রিপোর্ট UNESCO নামে প্রাকশ করে 2006 সালে। UNESCO -র এই ধরনের পদক্ষেপ-এর কারণ হল যে রাষ্ট্র সংঘ 2003-2012 সাল পর্যন্ত এই এক দশকের সাক্ষরতার দশক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাই UNESCO হচ্ছে বিশ্ব সাক্ষরতা অভিযানে অন্যতম আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষাকারী সংস্থা।

❑ বিশ্ব শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক ঃ

Global Monitoring Report -এ বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে দিকগুলি উঠে এসেছে সেগুলি হল —

(1) 1998 সাল থেকে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচির অন্যতম পরিকল্পনা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে।

(2) প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বিভিন্ন স্বল্প আয়যুক্ত দেশগুলিতে যেমন আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের দেশগুলি, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে দ্রতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(3) বিশ্বে 163 টি দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে 47 টি দেশে UPE সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে।

(4) এই রিপোর্ট থেকে অনুমান করা যায় যে, বিশ্বের 20 টি দেশ 2015 এর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এবং 44 টি দেশের UPE-এর পরিস্থিতি তা উন্নত হবে, কিন্তু 2015 এর মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে না।

(5) উন্নতিশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

(6) বিভিন্ন দেশের সরকারি আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ সমস্যা ঃ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া গেলেও বিশ্বের অনেক দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

Global Monitoring Report -এ যে যে সমস্যা উঠে এসেছে সেগুলি হল —

(1) বিশ্বের 100 কোটি শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ মেয়ে।

(2) বিশ্বের 23 টি দেশে UPE-এর হার বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে হ্রাস পাচ্ছে।

(3) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্থীর বেতন কাঠামো অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ এখনও অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হয়নি।

(4) যে সকল অঞ্চলে উচ্চ জন্ম হার, HIV / AIDS -এর আক্রান্তের সংখ্যা বেশি সেই সকল অঞ্চলে সকলের জন্য শিক্ষা (EFA) কর্মসূচি প্রণয়ন করা খুবই অসুবিধাজনক।

(5) 180 টি দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে 76 টি দেশে লিঙ্গ বৈষম্যের হার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী।

(6) 172 টি দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে 113 টি দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের হার বেশী।

(7) বিভিন্ন দেশে Early Chidhood Care and Education কর্মসূচির গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি।

(8) বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার সংখ্যা খুবই কম।

(9) আবার বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট নয়।

(10) বিভিন্ন দেশে যুবক ও বয়স্ক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য সরকারি সাহায্য যথাযথ নয়।

❑ বিশ্ব সাক্ষরতা অভিযান এবং UNESCO রিপোর্টের সুপারিশ ঃ

উপরিউক্ত সংখ্যাগত হিসাব দেখলে বোঝা যায় যে, বিশ্বের সাক্ষরতার অভিযান আরও জোরদার করতে হবে। তবে সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। এর জন্য UNESCO রিপোর্টের যে সকল সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল —

(1) সাক্ষরতা অভিযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(2) বয়স্ক শিক্ষা এবং বিশেষ করে যুবকদের শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে।

(3) সাক্ষরতা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের কাঠামো রক্ষা করতে হবে।

(4) সাক্ষরতা অভিযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সঠিক পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ করতে হবে।

(5) নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাক্ষরতা কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে যাতে সেই অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষেরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করতে উজ্জীবিত হয়।

(6) এই সকল কর্মসূচিতে যে সকল শিক্ষাবিদ যুক্ত থাকবেন তাঁদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে।

(7) সাক্ষরতার বিভিন্ন কর্মসূচি যেন স্থানীয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই কর্মসূচির ক্রমরূপ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছলে পরবর্তী ক্ষেত্রে সরকারি ভাষায় প্রয়োগ বাস্তব সম্মত হবে।

(8) বিভিন্ন দেশের মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে, তার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করতে হবে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে হবে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

HIV/AIDS -এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সর্বোপরি নাগরিকদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপরিউক্ত এই সকল পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও Global Monitoring Report -এ সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় দেশের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষিত করে তোলার উপর, তার জন্য প্রয়োজন অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের সহযোগিতা। শুধুমাত্র সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছলেই হবে না, তার জন্য দেশের মধ্যে নানান ধরনের প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উন্নতি করতে হবে।

৫.৪ ❑ একবিংশ শতকের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন ঃ

1991 সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত UNESCO -র এক জেনারেল কনফারেন্সে আমন্ত্রিত ডিরেক্টর জেনারেলকে বলা হল যে, একটি আন্তর্জাতিক কমিশন ডাকতে হবে এবং এই কমিশন শিক্ষা ও শিখন বিষয়ে মূলত আলোকপাত করবে, যাতে শিক্ষার সামগ্রিক বিষয় একবিংশ শতকে পরিস্ফুটিত হয়। Federico Mayor অনুরোধ করলেন Jacques Delors -কে এই কমিশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে এবং 14 জন বিশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিও সদস্যবৃন্দ থাকবেন সারা পৃথিবীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতির উচ্চশিখরে বর্তমান।

❑ আন্তর্জাতিক কমিশন এবং UNESCO ঃ

শিক্ষা UNESCO এর উপরে আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission) আক্ষরিক অর্থে গঠিত হল ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে। যে কমিশনের ব্যয়ভার বহন করবে UNESCO এবং UNESCO-এর সেক্রেটারিয়েট (Secretariate) -এর সাহায্যে কর্মসম্পাদন করা হবে। কমিশন এই সংস্থার সাহায্যে সংঘবদ্ধভাবে কর্মপদ্ধতি ঠিক করবে এবং কোথায় কোথায় এর রসদ ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা দেখবে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পৃথিবীর জনগণকে নানা তথ্য সরবরাহ করে অভিভূত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এই কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা এবং তার কাজকর্ম স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে যাতে এই সংস্থা বিভিন্ন সত্যের যে বক্তব্য তা লিপিবদ্ধ করে এগিয়ে যেতে পারে।

❑ UNESCO -র ভূমিকা ঃ

বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় UNESCO আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে তার তথ্য সরবরাহ করেছে এবং সারা বিশ্বজুড়ে শিক্ষার উপরে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। UNESCO ডিরেক্টর Mr. Philip H. Coombs. 1968 সালে "The World Educational; Crisis. A System Analysis" -গ্রন্থের মাধ্যমে International Instilute for Educational Planing (IIEP) বিষয়টিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। যে যে বিষয়ে সংকটের সম্মুখীন হওয়ার কথা তিনি বলেছেন — তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

❑ এডগার ফ'রে রিপোর্ট (Edgar Faure's Report) ঃ

UNESCO সারা বিশ্বজুড়ে যে ছাত্র জাগরণের ডাক দেয়, তাতে Renemaheu (then Director-General of UNESCO) বলেন যে, (৩-বছর পূর্বের) পূর্বতন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী Edgar Faure, যিনি 7 জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যে প্যানেল গঠন করেন তাতে শিক্ষার নতুন নতুন দিকের উপর লক্ষ্যমাত্রা রেখে গুরুত্ব আরোপ করা হয় — যা জ্ঞানের এবং সমাজের আশু পরিবর্তন সাধন

করবে। এরই সঙ্গে প্রগতির চাহিদা, ব্যক্তির ইচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতা শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখবে। এর ফলে, বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা সাধন করা যাবে এবং মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা যাবে। অর্থকরী ব্যয়ের মাধ্যমে আশু ফল লাভের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে 1972 সালে একটি বই লেখা হল, যার নাম "Learning to Be", Edgar Faure Commission -এর রিপোর্টে আত্মপ্রকাশ করল। মানুষের পারিবারিক জীবনের যে ধারণা, সেই ধারণার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল জীবনব্যাপী শিক্ষার অনুবন্ধ। ঠিক সেই সময়ে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে একটি প্রথাগত শিক্ষা, সেই শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানাল Edgar Faure রিপোর্ট।

❑ শিক্ষার বৈচিত্র্যমূলক পটভূমি ঃ

প্রথম এবং সর্বপ্রধান যে অসুবিধার সম্মুখীন হল কমিশন, তা হল মেন্ডেটের (Mandate) প্রেক্ষাপটে শিক্ষার বৈচিত্র্যমূলক পটভূমি তৈরিকরণ। এ ছাড়া শিক্ষা, দর্শন, শিক্ষার বাস্তবতা, শিক্ষালয়ের গঠন — এসবই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অসুবিধা সম্পর্কযুক্ত ছিল, তা মূলত যে তথ্য সরবরাহ করেছিল তার পরিমাণগত দিক। কমিশনের এই তথ্যে ছিল অসম্ভবতা এবং তথ্য গ্রহণ করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। ফলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কমিশনের কাজকর্মকে আরও উন্নত করতে গেলে এই কর্মের নির্বাচন একান্ত দরকার ছিল। কারণ ভৌগোলিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে স্রোতধারা মানুষের মনে বহমান, তার কার্যকারিতার ভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার রাজনৈতিক বিষ (Political Poison)।

৬ ধরনের অনুসন্ধানমূলক তথ্য গৃহীত হয়েছিল যা ক্রমিক পর্যায়ে অনুপ্রাণিত করেছিল তার কর্ম এবং লক্ষ্যকে শিক্ষার পথে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং নাগরিকতা, শিক্ষা এবং সামাজিকতা, কর্ম এবং কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং প্রগতি শিক্ষা গবেষণা এবং বিজ্ঞানের প্রগতি। ৬ প্রকার অনুসন্ধানমূলক বিষয় ৩টি বিষয়ের উপর মূলত সম্পৃক্ত ছিল, যাতে প্রত্যক্ষভাবে কমিশন শিক্ষার প্রগতিতে কাজ করতে পারে। সামগ্রিক প্রগতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারিগরি ব্যবস্থা, শিক্ষক এবং শিক্ষার প্রগতি, এ ছাড়া পরিচালন ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখবে।

❑ আন্তর্জাতিক কমিশনের ব্যাপকতা ঃ

আন্তর্জাতিক কমিশন যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, কারণ আলোচনার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব করা প্রয়োজন ছিল। কমিশন বহু শিক্ষাবর্ষের মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিল অন্তত ৭ বার, ৪টি working group -এ কমিশন মূল বিষয় নির্বাচন করে তার পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিল। এক একটি অঞ্চলের এক একটি দেশ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছিল। ব্যাপক অর্থে লিপ্ত রয়েছে এমন ব্যক্তিত্বের সংস্থা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক-গবেষক, ছাত্র সরকারি অফিসার, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশজ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত মতামতকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, ফলে কমিশনের কর্মপদ্ধতির ব্যাপকতার দিক থেকে এবং গভীরতার দিক থেকে শিক্ষার খুঁটিনাটি দিক গৃহীত হয়েছিল, সামনাসামনি বসে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা এবং লিখিত মতামত তাও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছিল। UNESCO থেকে সমস্ত জাতীয় কমিশনক বলা হয়েছিল শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন

পাঠাতে এবং তা Documentation বা fresh material হিসাবে কমিশনের কাছে জমা দিতে। পরবর্তীকালে সেগুলি আলোচিত হয়ে তার সদার্থক দিক উল্লেখিত হয়েছিল।

তা ছাড়া বেসরকারি সংস্থার সঙ্গেও আলোচিত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতি গৃহীত হয়েছিল। গত আড়াই বছর ধরে কমিশনের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অনবরত সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মত ও আদর্শ বিনিময় করে কার্য সম্পাদনা করে আসছিল। অনেককে বলা হয়েছিল লিখিতভাবে কমিশনের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধীয় তাদের বক্তব্য পাঠাতে — তাঁদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিল। 1996 সালের 11 এপ্রিল "The Treasure Within" এই বইটি UNESCO -এর Directer General কে অর্পণ করা হয়, UNESCO পরবর্তীকালে এই বইয়ের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি কর্মের নমুনা হিসাবে কমিশনের জন্য in a companion volume হিসাবে প্রকাশ করবে।

❑ শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করতে UNESCO -র ভূমিকা ঃ

বিশ্বযুদ্ধের দামামায় যখন সারা বিশ্ব এক অজানা আতঙ্কে ভুগছে, যখন বিচার, আইন, মানবীয় অধিকার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে মৌলিক অধিকার থেকে মানব সমাজ বঞ্চিত ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আশার আলো হিসাবে জন্ম হয় UNESCO নামে সংগঠনের। জন্ম তারিখটি ছিল 1945 সালের 16 নভেম্বর। শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে UNESCO লক্ষ্য করলেন নানারকম সমস্যা যা পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছে। মানুষ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্যাগুলো হল সাংস্কৃতিক জ্ঞানভাণ্ডারের উন্নয়ন, নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভব অর্থাৎ জ্ঞানের বিস্ফোরণ, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, শ্রেনি বিভাজন, লিঙ্গ বিভাজন, অসুস্থ পরিবেশ, বিশ্বায়ন, বিশ্ব অস্থিরতা, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ইত্যাদি।

বিশ্ব সমাজের এই সমস্ত সমস্যা সমাধানকল্পে ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত উপায়, মাধ্যম, কৌশল, পরিকাঠামো ইত্যাদির সন্ধান দিতে UNESCO 1971 সালে International Commission on the Development of Education গঠন করে। যার সভাপতি নিযুক্ত হন ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী Ddgar Faure। এই প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশন 1972 সাল "Learning to Be" এই শিরোপায় তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে 4 টি ধারণর উল্লেখ করা হয়।

(i) আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংস্কৃতি।

(ii) গণতন্ত্রের বিশ্বাস।

(iii) ব্যাক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন।

(iv) জীবন ব্যাপী শিক্ষা। যদিও এই চতুর্থ ধারণাটি আগেই দিয়েছিলেন তৎকালীন UNESCO -এর Director General-Rene Mahen।

❑ আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন এবং শিক্ষার স্তম্ভ ঃ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিশ্বব্যাপী যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এর আগে তা কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদগণ তাই বিগত শতাব্দীর নব্বই- এর দশকে ভবিষ্যতের আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয়

পরিবর্তন ঘটলে ও তৃতীয় বিশ্ব তা থেকে বঞ্চিত। মুক্তির উপায় হল শিক্ষার প্রসার। এই ভাবনার মূল হোতা হিসাবে UNESCO 1991 সালের নভেম্বর মাসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এর সাধারণ সভায় তদানীন্তন Director General Federico Mayor -কে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও শিক্ষণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠনের অনুরোধ করা হয়। সেই অনুসারে 1993 সালের শুরুতে ফ্রান্সের প্রাক্তন অর্থনীতি ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রী Jacques Delors-এর সভাপতিত্বে The International Commission on education for the 21st Century গঠিত হয়। এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জর্ডন, জাপান, পোর্তুগাল, ভেনেজুয়েলা, সেনেগাল, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশগুলি। এই কমিশনের শিক্ষার নানা দিক পর্যালোচনা করে 1996 সালে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা "Learning: The treasure within" নামে পরিচিত। কমিশনের বক্তব্য হল অত্যন্ত কম সময়ে দক্ষতার সঙ্গে সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যকরী জ্ঞান ভাণ্ডারের সঞ্চালন ঘটাতে হবে। এর জন্য কমিশন তুলনামূলকভাবে নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শিখন কৌশলের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলেন। আর এই কাজে সাফল্য অর্জন -এর কথা ভেবেই কমিশন শিক্ষার 4 টি স্তম্ভের কথা Report -এ পেশ করেছেন। স্তম্ভগুলো হল —

(i) কিছু জানতে শেখা (Learning to know)।

(ii) করতে শেখা (Learning to do)।

(iii) একসঙ্গে বসবাস করতে শেখা (Learning to live together)।

(iv) কিছু হতে শেখা বা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা লাভ করা (Learning to be)।

❑ শিক্ষার স্তম্ভ ঃ

(i) কিছু জানতে শেখা (Learning to know) ঃ শিক্ষার প্রথম স্তর হল জানতে শেখা, কী জানবে? অজানাকে জানবে। গতনুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার জ্ঞানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রয়োজন। এই জ্ঞান উপলব্ধি না করার ফলই হল আজকের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবসমাজের অস্থিরতা। জ্ঞান হল শক্তি, যা ব্যক্তিকে দৃঢ় এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। জ্ঞানের আরেক নাম উপলব্ধি। যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনিই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ঘটাতে পারেন বিশ্বের সমৃদ্ধি। পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে সংগতি বিধান প্রয়োজন। এই সংগতি হবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। জ্ঞান ব্যক্তিকে বা শিক্ষার্থীকে কর্মদক্ষ হিসাবে তৈরী করে। ব্যক্তির জীবন সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়; যদি ব্যক্তি সত্য সেবা নীতি, ধর্ম ও কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে। তাই এই ধারণা অনুসারে শুধু জ্ঞান আহরণই নয়, জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি ও কৌশলগুলি রপ্ত করাই হবে তখনই, যখন মানুষ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানব অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায় খুঁজে পাবে।

তাই মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে ও লিখন প্রণালীর এবং মূল শিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে সংমিশ্রণে শিক্ষার্থী ধীরে ন্যায়নীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতি হবে।

(ii) করতে শেখা (Learning to do) ঃ শিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল কর্মদক্ষতার জন্য শিক্ষা আগে জানতে হয়। তারপর দক্ষতা দেখাতে হয়, তাই জানার সঙ্গে কর্মদক্ষতার একটা নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। বিংশ শতাব্দীতে কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব বৌদ্ধিক ও মানসিক কাজ অধিক প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দৈহিক শ্রমের উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন পরিসেবামূলক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী উন্নতি, সামাজিক দক্ষতা এবং ভাব বিনিময় ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা অনুমান ক্ষমতা, সাধারণ জ্ঞান, বিচারশক্তি, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলির প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কাজেই আধুনিক শিল্প পরিবেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুকে সৃজনশীল ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার এবং নব নব চিন্তার উপযোগী যোগ্যতাসম্পন্ন আধুনিক উৎপাদনের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

(iii) একসঙ্গে বসবাস করতে শেখা (Learning to live together) ঃ মানুষ জন্মলাভ করে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে। তারা একা বসবাস করতে পারে না। আর এক সঙ্গে বসবাস করতে হলে তাকে সামাজিক আচরণ মেনে চলতে হবে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আদিম কামনা-বাসনা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলে খেয়ালখুশি মতো চালনা করা যাবে না। অল্প বয়সে শিশুরা মনের অজান্তে অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। তাই পারস্পরিক নির্ভরতা অত্যন্ত জরুরি। পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমেই মনুষ্য সমাজ সঠিক দিশা পায়। যদি অন্যকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করে, ইতিহাস মূল্যবোধ উপলব্ধি করে, তাহলে এক সঙ্গে বাঁচতে শেখা যায়। শিক্ষা মানুষকে ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে প্রেরণা যোগায়। যে কোনো সমস্যার সর্বজনীন বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ দেখায় শিক্ষা, অনিবার্য সংঘাতগুলোকে বিচক্ষণ ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখায় শিক্ষা। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একসঙ্গে বাঁচতে শেখা।

(iv) কিছু হতে শেখা বা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা লাভ করা (Learning to be) ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। দেহে, মনে বুদ্ধিতে, সংবেদনশীলতায়, সৌন্দর্যচর্চায়, আত্মিক দিক থেকে একটি ব্যক্তি সম্পূর্ণতার অধিকারী হয়ে উঠুক-সবসময়-ই শিক্ষার এই লক্ষ্যটিই প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তির এই অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন হলে ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র জগতের স্বার্থে সংগতিবিধান সম্ভব হবে এবং জগতে শান্তি বজায় থাকবে। জগৎ ক্রমশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যের শেষতম সংযোজন হলেও এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 1972 সালে (Edgar Faure) Learning to Be ঃ The World of Education today and tomorrow অর্থাৎ ''হতে শেখা'' ''বর্তমান বা আগামী দিনের শিক্ষা জগৎ'' - শীর্ষক প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, যে গতিতে সমাজে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার ঘটছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তির অভাব ঘটবে। শিক্ষা অতি অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন করে, নিজেকে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তুলবে। এর জন্য চাই আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতি। গণতন্ত্রে বিশ্বাস, ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা।

❑ **আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগের কার্যাবলি ঃ (The Work of the Commission) ঃ**1991 সালে একটি আন্তর্জাতিক সভায় শিক্ষা এবং শিখনের (Education and Learning) উপর একুশ শতাব্দীর একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগ গঠনের কথা বলা হয়, সমগ্র পৃথিবী থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক (Cultural and Professionl background) এবং পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন এরকম 14 জন মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে জ্যাক ডিলর -এর নেতৃত্বে / পৌরোহিত্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। (Fedrico Mayor requested to Jacques Delors to Chairman of the Commission)।

❑ **আন্তর্জাতিক জাতীয় কমিশন গঠন ঃ**

অবশেষে 1993 সালের সূচনা পর্বে জ্যাকস ডিলরস এর নেতৃত্বে একুশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগ গঠিত হয়। যার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে UNESCO এবং কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন সংগঠন -এর সম্পাদকমণ্ডলী (Secretariate) তাদের মূল্যবান মতাদর্শ এবং আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা (International Experience) তথ্য হিসাবে এই সংস্থাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে।

❑ **মূল লক্ষ্য ঃ**

এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগ শিক্ষার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক (Individual and Societal) দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে 6 টি অনুসন্ধানের (enquiry) মূল লক্ষ্যের (Six lines of enquiry) উপর আলোকপাত করে —

(1) Education and Culture - শিক্ষা এবং সংস্কৃতি।

(2) Education and Citizenship - শিক্ষা এবং নাগরিকত্ব।

(3) Education and Social Cohesion - শিক্ষা এবং সামাজিকতার মেলবন্ধন।

(4) Education, Work and Employment - শিক্ষা এবং কর্ম এবং জীবিকা।

(5) Education and Development - শিক্ষা এবং উন্নয়ন।

(6) Education, Research and Science - শিক্ষা, গবেষণা এবং বিজ্ঞান। অনুসন্ধানের এই ৬টি ক্ষেত্র শিক্ষা পদ্ধতির ৩ টি ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত —

(i) Communication Technology - প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ক্ষেত্র।

(ii) Teachers and the teaching process - শিক্ষক এবং শিক্ষাদান কৌশল।

(iii) Financing and Management - অর্থনীতি এবং ব্যবস্থাপনা।

❑ **আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের লক্ষ্য এবং কর্মসূচি ঃ**

একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধ্যয়ন এবং শিক্ষার বিভিন্ন দিক — এর ওপর নির্দেশনা এবং কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য এক বিধিবদ্ধ খসড়া প্রস্তুতিকরণ।

এর জন্য প্রাথমিকভাবে সরকারকে কিছু নির্দেশনা দান এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মধ্য কর্মসূচিগুলিকে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। এর জন্য প্রধান দায়িত্ব UNESCO-র ওপর অর্পণের কথা বলা হয়েছে।

❑ আধুনিক সমাজে শিক্ষার নতুন ভূমিকা ঃ

আয়োগ (Commission) শিক্ষার একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের ওপর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে বলে আগামী শতাব্দীর সমাজ কোন ধরনের শিক্ষা পেতে আগ্রহী তা জানা যাবে। [What kind of education is needed for what kind of societies of tomorrow] বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পরিবেশ এবং সামাজিক পুনর্গঠনের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চলতে থাকা আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নতুন ভূমিকা এবং শিক্ষার নতুন দাবি দাওয়াগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে হবে। এর জন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে শিক্ষাদান, (পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজের বিভিন্ন সদস্য) এর জন্য সরকার, সমাজ, শিক্ষাবিদ, গবেষক সকলকে আগামী শতাব্দীর জন্য বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষা (Education) এবং শিক্ষা পদ্ধতির (Education System) উপর বিশেষ নজর দিতে হবে —

❑ শিক্ষা এবং শিক্ষা পদ্ধতির উপর বিশেষ নজর ঃ

প্রথমতঃ — যাতে শিক্ষা তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিধির ওপর কতটা ব্যাপ্ত আছে তা দেখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ — শিক্ষার গঠন (Structure), মডেল (Models), পরিধি এবং পদ্ধতির (System) উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

শিক্ষা আয়োগ শিক্ষার সর্বাধুনিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে (Current Situation) একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রার পুনর্গঠন এবং মানসম্পদের বিকাশ (Human development) এর উপর জোর দেয়। এই শতাব্দীর শিক্ষা হবে গতিশীল, ব্যক্তি এবং সমাজব্যবস্থার উপযোগী - এই ভাবধারায় গড়ে ওঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে।

❑ আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগের নীতি (Principles) ঃ

শিক্ষার অগ্রগতির জন্য (Progress of Education) ঃ কমিশন সর্বাত্মক গ্রহণযোগ্য কিছু নীতি শিক্ষাবিদ (educators), নাগরিকবৃন্দ (citizens), নীতি নির্ধারকগণ (Policy makers) এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সকলের জন্যও স্থির করেন।

First : Eduation is a basic human right and universal human value ঃ শিক্ষা মানুষের সর্বজনীন অধিকার-এর কথা বলে এবং এর একটি মানবতার মূল্য আছে। শিক্ষা ব্যক্তি এবং সমাজনির্ভর একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া।

Second : Eduation, formal and non-formal, must serve society ঃ শিক্ষা প্রথাগত বা প্রথামুক্ত যা হোক না - সকলের লক্ষ্য হবে সমাজের সেবা করা - শিক্ষা হবে, সৃষ্টিমূলক গতিশীল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার হাতিয়ার।

Third : যে কোনো শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত - enquity relevance এবং Excellence ।

Fourth : যে কোনো শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নীতিসমূহের লক্ষ্য, ফলাফল এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এবং পদক্ষেপ লক্ষ্যণীয়।

Fifth : শিক্ষার গতিশীলতার দিকে লক্ষ রেখে শিক্ষা হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতি নির্ভর যার মধ্যে থাকে মনুষ্যত্বের অধিকার (Human rights), Tolerance (সহনশীলতা), Understanding (বোঝাপড়া), Democracy (গণতন্ত্র), Responsibilities (দায়িত্ববোধ), Universality (বিশ্বজনীনতা), শান্তির অনুসন্ধান (Search for peace) পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচি নির্ভর শিক্ষা।

Sixth : শিক্ষার মধ্যে থাকবে সামাজিক দায়বদ্ধতা - Education is the responsibility of the whole of society । সমাজের সকল মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

৫.৫ ❑ জাতীয় মেধা আয়োগ (National Knowledge Commission - NKC)

2005 সালে 13 জুন জাতীয় স্তরে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে জাতীয় নলেজ কমিশন প্রতিষ্ঠা হয়।

শর্তগুলি হল —

(i) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতকে প্রতিযোগিতামূলক স্তরে প্রতিষ্ঠা করাই হবে এই কমিশনের শর্ত।

(ii) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের দ্বার খুলে দেওয়া।

(iii) বৌদ্ধিক শর্তাধিকারের ভিত্তিতে Management প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো।

(iv) কৃষি ও শিল্পে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।

(v) জনগণের স্বার্থে জাতীয় সরকারের সেবামূলক মনোভাবের সম্প্রসারণ, বিনিময় ও উন্নয়নের কৌশলের উন্নতি ঘটানো।

❑ জাতীয় মেধা আয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

নলেজ কমিশনের উদ্দেশ্য হল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। প্রচলিত জ্ঞানের উন্নয়ন এবং নতুন ধারাব সৃজনশীল জ্ঞানের প্রসার। এই উদ্দেশ্যে কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা হল শিক্ষা পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া। স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষিতে বেসরকারি উদ্যোগ ও গবেষণাকে কাজে লাগানো। সরকারিভাবে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটানো। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আলাপচারিতা ও কৌশলের বিনিয়ম করা।

❑ মেধা আয়োগের উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ ঃ

মেধা আয়োগের প্রধান উপদেষ্টা হলেন পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অশোক কোলাসকর, S. Regunathan, Smt. Kumud, Bansal, Mrs. Kiran Datar। কমিশনের অন্যান্য উপদেষ্টাগণ হলেন Sunil Bahari, Omlanjali Goswami, Namita Dalmia, Maya Prodhan, Sukhman Randhawa, Deepti Ayanki, Aashima Seth.

কমিশনের সদস্যরা হলেন কমিশনের চেয়ারম্যান Mr. Sam Pitroda, অন্যান্য সদস্যরা হলেন ড. অশোক গাঙ্গুলি, প্রফেসর বলরাম, ড. জয়তী ঘোষ, ড. দীপক নায়ার, Mrs. Sujata Ramdorai এবং Prof. Amitabha Malto.

মেধা আয়োগ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নলেজ কমিশন এ পর্যন্ত ২২ টি বিষয়ে পরামর্শ দান করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অনুবাদ, ভাষা, লাইব্রেরি, নেটওয়ার্ক, বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ডাক্তারিশিক্ষা, ম্যানেজমেন্ট, গণিত ও বিজ্ঞান, দূরাগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়।

অনুবাদ ঃ 2006 সালে 20 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং মেধা আয়োগের উপদেষ্টা এবং সদস্যদের নিয়ে প্রথম সভা করেন। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল অনুবাদের উপর গুরুত্বদান। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের অনুবাদ যে জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এ বিষয় নলেজ কমিশন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। এমনকি এ বিষয়ে জড়িত থেকে প্রায় ২ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন।

ভাষা ঃ 2006 সালে 20 অক্টোবর আবার প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং মেধা আয়োগের সদস্যদের সঙ্গে সভা করে ইংরাজি ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধিকাংশ বই এবং পত্রিকা ইংরাজি ভাষায় রচিত অথচ বিগত শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের মাত্র এক শতাংশ মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজি ব্যবহার করে। বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ইংরাজি ভালোভাবে না জানার ফলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর্থিক কারণে সাধারণ মানের জনগন তাদের সন্তানদের ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই বিষয়ে সরকারিভাবে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জাতীয় নলেজ কমিশন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ইংরাজি অতীব প্রয়োজন। তাই এই বিষয়ে নলেজ কমিশনের সিদ্ধান্তে হল ইংরাজি প্রথম ভাষা হিসাবে (দ্বিতীয় মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা) বিদ্যালয় স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে চালু করা উচিত এবং জাতীয় স্তরে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজির উপর এমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার যাতে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ও মাতৃভাষায় সমভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় শিক্ষা ঃ মেধা আয়োগের দেশের বিভিন্ন জায়গায় তথ্য অনুসন্ধান করে ২০০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে তার মর্মার্থ হল এরকম - বিদ্যালয়ের গুণমান বাড়াতে হলে জাতীয় স্তরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। কেননা যেহেতু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পঠন পাঠন ও শিক্ষক নিয়োগের প্রাথমিক দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, সেহেতু গুণগত উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন সেখানে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে। সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারকে আইনি অধিকারে এনে আর্থিক সহায়তায় গুণগত মানের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় আরও নমনীয় ভাব পোষণ করে স্থানীয় প্রশাসনকে যুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয় পরিকাঠামো ও পরিবেশ

একইরকম হওয়া উচিত। শিক্ষার গুণগত মানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি ও সরকারি বিদ্যালয়ের সহযোগিতা কাম্য। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিতি অবশ্যই আশানুরূপ হওয়া দরকার। স্থানীয় স্কুল প্রশাসক ও সরকারি শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় আবশ্যিক বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রথার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। তাই যোগ্য শিক্ষক যেন শিক্ষকতা বিষয়ে নিযুক্ত হন সেটা দেখতে হবে। আর শিক্ষা ছাড়া অন্য কাজ এমনকি ভোট নেওয়ার কাজ থেকেও শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া উচিত। পঠন পাঠনে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। শিক্ষকতা বিষয়ে যাঁরা নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন তাঁরা যেমন শিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকতা কাজে যোগ দেবেন, আবার শিক্ষকতা করা কালীন বিশেষ বিশেষ অত্যাধুনিক আবিষ্কৃত তথ্য তত্ত্বের সঙ্গে যাতে পরিচয় ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে সরকারি ভাবে জোরদার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে পাঠক্রমের ও পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে কম্পিউটার শিক্ষা, শিক্ষার্থী শিক্ষক ও প্রশিক্ষক প্রশাসনিক কর্মচারী সকল স্তরে যাতে কার্যকারী করা হয় তার দিকে নজর দিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় যাতে পিছিয়ে না পড়ে থাকে, তারাও যাতে স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এইভাবে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবেই।

উচ্চশিক্ষা ঃ 2006 সালে 29 নভেম্বর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় নলেজ কমিশন উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে যে বক্তব্য পেশ করেন তা হল স্বাধীন ভারতবর্ষে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অথচ আজও ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাত্র অল্প অংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রত্যেক শিশুর উচ্চ শিক্ষার জগতে প্রবেশাধিকার সমান। কেন এই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না, এ বিষয়ে নলেজ কমিশন সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার খোঁজখবর করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং যে আশার আলো দেখিয়েছেন তা হল —

(i) অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষে এখনকার জনসংখ্যার অনুপাতে অন্ততপক্ষে 1,500 বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে 2015 সালের মধ্যে 15% শিশুর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

(ii) উচ্চশিক্ষার প্রবেশাধিকারে যে কঠোর নিয়ম কানুন বলবৎ আছে তা শিথিল করা দরকার।

(iii) উচ্চশিক্ষায় উদার অর্থনীতিকরণ প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভাব বহনের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগকে সবভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(iv) শিক্ষার গুণগত মান ধরে রাখার জন্য পথপ্রদর্শক হিসাবে ভারতবর্ষে অন্তঃপক্ষে ৫০ টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

(v) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনঃ সংস্করণ প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে ৩ বছরে একবার পাঠক্রমের পরিবর্তন দরকার। বাৎসরিক পরীক্ষা মূল্যায়ন ব্যবস্থা অভন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর বেশি

গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আশানুরূপ হতে হবে। এমনকি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় রাখা দরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উৎকৃষ্টতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কলেজগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে।

(vi) আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন কোনো শিক্ষার্থীই বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংরক্ষণ অবশ্যই থাকবে- তবে তা হবে আর্থিক, লিঙ্গ, ধর্ম ও বসবাসের স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় নলেজ কমিশনের বক্তব্য হল — আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে সত্যিকারের বাস্তব উদ্যোগে ভারতবর্ষকে ২০২৫ সালের মধ্যে গড়ে তুলতে হয় তাহলে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের এটাই হল উপযুক্ত সময়।

❑ উচ্চশিক্ষা/ মেধা আয়োগ (Higher Education/Knowledge Commission) :

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক বিকাশ সাধন এবং গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান সাধনে উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণও আছে। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করার মতো যত বয়স্ক ছাত্রছাত্রী আছে তার মাত্র ৭ শতাংশ উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করে। উচ্চশিক্ষায় সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অনুপাতে আসন সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আমাদের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে না। আরও উল্লেখ্য যে, ভাতবর্ষের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান প্রত্যাশিত মানের থেকে অনেক কম।

মেধা আয়োগের মতে, বিদ্যালয় সংস্থার সম্প্রসারণ ও সংস্কারের উপর জোর দিতে হবে যাতে প্রতিটি শিশুর উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করার সুযোগ নিশ্চিত হয়। NKC বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারেও আলোচনায় নিযুক্ত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কমিশন তার সুপারিশগুলি পেশ করবে। এই সুপারিশ সমূহ উচ্চশিক্ষার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

NKC এই ব্যাপারে উচ্চশিক্ষার জগতের বিশাল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত ভাবে আলোচনা করেছে। এ ছাড়াও এই কমিশন উক্ত ব্যাপারে পার্লামেন্টের, সরকারের, নাগরিক সমাজের এবং শিল্প জগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট ও সর্বসম্মত ধারণা হল, এই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তন দরকার, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান না কমিয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে/ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষিত করা যায়। বাস্তবিক উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অনেকাংশেই জনগণের শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের উপর নির্ভর করছে।

আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের লক্ষ্যগুলি অবশ্যই হওয়া উচিত সম্প্রসারণ, উৎকর্ষ সাধান ও সর্বব্যাপীকরণ। NKC মনে করে যে, এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে সামনে রেখে সদর্থক সংস্কার সাধন শুধু জটিলই নয়, কষ্টকরও বটে। তা সত্ত্বেও এই সংস্কার সাধনের একান্ত প্রয়োজন।

❑ ভাষা শিক্ষা সম্প্রসারণ :

(ক) অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন :

উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রায় ১৫০০০ এর মতো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে Gross Enrolment Ratio (GER বা মোট ছাত্র ভর্তি বা অন্তর্ভূক্তিকরণের হার) ২০১৫ এর মধ্যে ১৫% পৌঁছায়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর আলোকপাত করতে হবে। কিন্তু একগুচ্ছ কলেজ যেখানে স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হয় সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে। এইরূপ সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন কাঠামোয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে।

(খ) উচ্চ শিক্ষার জন্য পূর্বে আইন ব্যবস্থা পরিবর্তন সাধন :

বর্তমান উচ্চশিক্ষার যে নিয়ম-ব্যবস্থা তা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। উচ্চশিক্ষার প্রবেশের পথ মসৃণ নয়। অনুমোদন সাপেক্ষে ভর্তি প্রক্রিয়াও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। এক্ষেত্রে অনেক নিয়ামক সংস্থা আছে যাদের আইনগুলি গোলমেলে এবং অনতিক্রম্য। গোটা প্রক্রিয়াটি অধিক নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু শাসনাধীন।

NKC একটি IRAHE (Independent Regulatory Authority for Higher Education) স্থাপনের সুস্পষ্ট প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে।

সংসদীয় আইনের মাধ্যমে IRAHE স্থাপন করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য যোগ্যতামান IRAHE-ই ঠিক করবে।

এটিই হবে সংস্থা যাকে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিগ্রি প্রদানের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দেওয়া হবে।

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বির্তক সমাধানের কাজ এই IRAHE-ই করবে।

এটি সরকারি ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম চালু করবে, তেমনিভাবে এটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম-বিধি চালু করবে।

IRAHE হবে সেই কতৃপক্ষ যা বিভিন্ন কৃতিত্ব আরোপকারী সংস্থাকে অনুমোদন দেবে। অনুদান প্রদানের ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখার জন্য UGC-এর ভূমিকার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। AICTE (All India Council for Technical Education), MCI (Medical Council of India) এবং BCI-এর অন্তর্গত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভর্তি নিয়ামক কার্যাবলি ত্রয় দ্বারা সম্পাদিত হবে, যাতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে সীমিত করা যায়।

(গ) উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারী খরচ বৃদ্ধি এবং অর্থের উৎসক্ষেত্রের সম্প্রসারণ :

অর্থের জোগান না বাড়ালে উচ্চশিক্ষা প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ সম্ভব নয় এবং এই অর্থ অবশ্যই সরকারী ও বেসরকারী উভয় উৎস থেকেই আসতে হবে।

যেহেতু সরকারী অর্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সমর্থন বাড়িয়ে GDP এর ১৫% করতে হবে যেখানে শিক্ষাখাতে GDP এর ৬% খরচ হয়।

উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য উক্ত অর্থই যথেষ্ট নয়, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী খরচের পরিপূরণ করতে পারবে এমন অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থের উৎসস্থল অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।

বেশিরভাগ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর জমি নিয়ে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালগুলিকে নিয়মে বেঁধে দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের প্রান্ত জমিকে অর্থের উৎস হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেতনক্রম ঠিক করবে যাতে শুধুমাত্র প্রাপ্ত বেতন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট খরচের ২০% পূরণ হয়ে যায়। তবে বেতনক্রম তারা নিজেরা ঠিক করলেও তাদেরকে ২টি শর্ত মানতে হবে-প্রথমত, অর্থনৈতিক দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব করে তাদের বৃত্তি দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের পড়ার খরচ চালাতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ বেতন নেওয়ার ফলে যে অর্থাগম হয় তা UGC তাদের অনুদান থেকে কেটে নেবে। এর ফলে নিয়মভঙ্গের (উচ্চবেতন নেওয়া) জন্য তারা কোনো শাস্তি পাবে না।

ভাতবর্ষের উচিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন দাতাদের Incentive-এর পরিবর্তন করে লোকহিতকর কাজের ধারা বজায় রাখা। বর্তমানে Tax Laws এবং Trust Laws উৎসক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন সাধন করা উচিত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের পছন্দসই খাতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং একটি Corpus গঠনের জন্য তাদের অর্জিত অর্থের ব্যবহার করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অন্যান্য অর্থের উৎস— যেমন প্রাক্তন ছাত্রদের দান এবং অনুমোদন সন্ধান করতে হবে। এ ছাড়া সাহায্যকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করতে হবে যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক বা পেশামূলক সংস্থাগুলিকে নিযুক্ত করার অনুমতি দেবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে যাতে শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটে। সরকারী অর্থের উৎসগুলির সুবিধা নিতে হবে, বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব থেকে যাতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা (লাভের জন্য নয়) আকৃষ্ট হয়।

(ঘ) ৬০ টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন :

NKC ৫০ টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিস করেছে। যেগুলি উচ্চমানের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। দেশের অন্যান্য অংশের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হিউম্যানিজম, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করবে। ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য হল, আগামী ৩ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে (কাজ শুরু)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দুভাবে স্থাপিত হতে পারে- হয় সরকারের দ্বারা নতুবা এমন কোনো বেসরকারী সংস্থার দ্বারা যেটি একটি সমাজ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা Section 25 Company স্থাপন করে।

যেহেতু বিশ্বব্যাপী সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাগমের একটি সাধারণ উৎসস্থল হল সরকারী সাহায্য, তাই বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাথমিকভাবে একটি বড়ো রকম অর্থসাহায্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া প্রয়োজন। সরকারী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার প্রয়োজনীয় জায়গার জন্য বৃহদায়তন স্থান বা জমি দেবে।

অতিরিক্ত জমি থেকে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। বর্তমানে Income Tax আরোপের নিয়মাবলিরও পরিবর্তন সাধন করতে হবে, যাতে অধিক হারে ভাতা প্রদান করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটা টাকা খরচ করা যাবে বা টাকা কোন্ কোন্ খাতে খরচ করতে হবে তার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা চলবেনা। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যলয়গুলি ছাত্রদের বেতনক্রম ঠিক করা ও অন্যান্য অর্থের উৎস সন্ধান করার ব্যাপারে স্বশাসন দিতে হবে। নলেজ কমিশনের প্রস্তাব হল এই যে, এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছাত্র ভর্ত্তি করতে হবে। তারা যোগ্যতামান অনুযায়ী ভর্তির নীতি অনুসরণ করবে। এর জন্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের ভালোরকম বৃত্তিপ্রদান করতে হবে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ৩ বছরের স্নাতক কোর্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোর্স বা বিষয়ের আবশ্যিক নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষা ব্যবস্থা ও তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। তাই শিক্ষাকে সেমিষ্টার ভিত্তিক করতে হবে এবং প্রতিটি কোর্সের শেষে ছাত্রদের আন্তর্মূল্যায়ন করতে হবে। একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তকরণও সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ বা Depatment এর গুণমান বাড়ানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। শিক্ষাপ্রদান এবং গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন স্থাপন করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে বিভাগীয় এবং তার অধীনে কোনো স্নাতকোত্তর কলেজ (যে সমস্ত কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়) থাকবে না।

❑ উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন (Excellence of Higher Education) :

❑ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন (Reform existing Universities) :

উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন অবশ্য খুবই প্রয়োজন। যে সমস্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলি হল :

(১) Universities should be required to revise or restructure curricula at least once in three years.

(২) Annual examinations which test memory rather than understanding, should be supplemented with continuous internal assesment which could begin with a weight of 25% in the total to be raised to 50% over a stipulated period.

(৩) NKC প্রস্তাব দিয়েছে যে একটি Course Credit System হিসাবে একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেতে হবে। সেখানে সেই শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি দেওয়া হবে, যারা বিভিন্ন কোর্সের আবশ্যিক সমস্ত পরীক্ষা দেবে। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের মনের মতো বিষয় খুঁজতে/বাছতে সুবিধা হবে।

(৪) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা- যা একে অপরকে সমৃদ্ধ করে, তা যাতে যৌথভাবে চলতে পারে তার জন্য পুনরায় গবেষণার কেন্দ্রস্থল করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। এর জন্য শুধু নীতি নির্ধারণ করলেই হবে না - অর্থের উৎস নির্ধারণ, পুরস্কার বিতরণ প্রক্রিয়া ও মননের পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

(৫) প্রতিভাবান শিক্ষক বা অধ্যাপকদের আকৃষ্ট করার জন্য তাঁদের ভালো কাজের পরিবেশ বা শর্ত (better working condition) এবং তার সঙ্গে কাজের দক্ষতা বা কৃতিত্ব অনুযায়ী তাঁদের incentives দেওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থবণ্টন নীতি বা মান নির্ধারণের জন্য বেতন (Salaries) বা পেনসনের (Pensions) জোগান এবং ভরণপোষণের (Maintenance) খরচ, উন্নয়নের খরচ এবং বিনিয়োগের মধ্যে আরও সুনিশ্চিতকরণ করার জন্য ন্যূনতম সমালোচনার গুরুত্ব বোঝা উচিত।

(৭) শিক্ষণ শিখনে সাহায্যকারী পরিকাঠামোর উপাদানগুলি যেমন — লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদিকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চপর্যায়ে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চালাতে হবে।

(৮) যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত নয় এবং যারা উন্নতিসাধন বা অগ্রগতি ঘটানোর জন্য দায়বদ্ধ থাকে না তাদের পরিচালন কাঠামো সংস্কার করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। উন্নয়নের জন্য অনেক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাতে হবে, কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা বা বিষয় না বললেই নয়। উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতিকে সরকারের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং সমকক্ষ বা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তই এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হওয়া উচিত। যে সমস্ত University courts, Under-graduate council, Academic council এবং Executive Council সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে মন্থর করে এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সর্বাগ্রে তাদের আয়তনের ও গঠনের পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

৫.৬. ❑ সংক্ষিপ্তসার (Summing up) :

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর ১৬৪ টি দেশ একত্রে যে বিষয়ে সহমত হয়, তাই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট —

এই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-এর মূল লক্ষ্যই ছিল সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশে গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ৬ টি মূল লক্ষ্যের অবতারণা করে। লক্ষ্যগুলি হল—

(১) শৈশব শিক্ষার উন্নয়ন;

(২) ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসা;

(৩) জীবনশৈলী বৃত্তিমূলক/কর্মমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ;

(৪) ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা;

(৫) ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে;

(৬) শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। UNESCO ২০০৬ সালে Global Monitoring Report প্রকাশ করে। Global Monitoring Report-এ কিছু ভাল দিক এবং কিছু সমস্যা ও উঠে এসেছে। সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে UNESCO রিপোর্টে কতকগুলি সুপারিশ উল্লেখ করেছে।

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষিত করে তোলার উপর, নানান ধরনের প্রথাগত ও প্রাথবহির্ভূত শিক্ষার উন্নতি করার কথাও রিপোর্টে বলা হয়েছে। শিক্ষার উপরে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলেও তৃতীয় বিশ্ব তা থেকে বঞ্চিত। মুক্তির উপায় হল শিক্ষার প্রসার। এই ভাবনার মূল হোতা হিসাবে UNESCO ১৯৯১ নভেম্বর মাসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০০৫ সালে ১৩ই জুন জাতীয় স্তরে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে জাতীয় নলেজ কমিশন প্রতিষ্ঠা হয়। নলেজ কমিশনের উদ্দেশ্য হল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। প্রচলিত জ্ঞানের উন্নয়ন এবং নতুন ধারার সৃজনশীল জ্ঞানের প্রসার। এই উদ্দেশ্যে কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা হল শিক্ষা পদ্ধতির উপর জোড় দেওয়া।

৫.৭. ❑ প্রশ্নাবলী (Questions) :

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট কি?

(খ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে UNESCO-র ভূমিকা কতটুকু?

(গ) ECCE (Early Childhood Care and Education)-এর লক্ষ্য কি?

(ঘ) শিক্ষায় আর্ন্তজাতিক কমিশন কত সালে গঠিত হয়?

(ঙ) জাতীয় মেধা আয়োগের উদ্দেশ্য কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের লক্ষ্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে - যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে তা আলোচনা করুন।

(গ) বিশ্ব সাক্ষরতা অভিযান এবং UNESCO রিপোর্টের সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

(ঘ) আর্ন্তজাতিক শিক্ষা আয়োগের শর্তগুলি উল্লেখ করুন।

(ঙ) জাতীয় মেধা আয়োগের শর্তগুলি উল্লেখ করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) শিক্ষাকে পুনগর্ঠিত করতে UNESCO-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভের কথা রিপোর্টে পেশ করেছেন তা বর্ণনা করুন।

(গ) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন অবশ্য প্রয়োজন- উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

(ঘ) মেধা আয়োগের মূল সুপারিশগুলি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করুন।

(ঙ) একবিংশ শতকের আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করুন।

৫.৮ ❑ উৎস (References) :

১। UNESCO'S Report on Education for Sustainable Development, Pairs, UNESCO.

২। UNESCO (2004) Education for All. The Quality imperative, EFA Global Monitoring Report.

৩। ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা — সরোজ চট্টোপাধ্যায়।

৪। আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা — ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, শেখ হামিদুল হক।

৫। সাম্প্রতিককালিন ভারতীয় শিক্ষার ধারা— ড. দেবাশিষ পাল, ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, হামিদুল হক।

একক : ৬

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা

(Universalisation of Secondary Education)

গঠন ❑ (Structure)

৬.১. সূচনা।

৬.২. উদ্দেশ্য।

৬.৩. সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মনীতি এবং পরিকল্পনার রূপায়ণ

(Policies and programmes for realizing the universalisation of secondary education)

৬.৪. শিক্ষা অধিকার আইন (Right to Education Act)

৬.৪.১. Right to Education and its implications for universalisation of Secondary Education

৬.৫. সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা (Status of USE)

৬.৫.১. প্রবেশাধিকার এবং তালিকাভুক্তি (Access and enrolement)

৬.৫.২. ধারণ ক্ষমতা (Retention)

৬.৫.৩. অর্জন করা (Achievement)

৬.৫.৪. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ

৬.৬. সারসংক্ষেপ

৬.৭. প্রশ্নাবলী

৬.৮. উৎস (References)

৬.১. ❑ সূচনা (Introduction)

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। এর পরবর্তীকালে শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) উল্লেখ করে যে জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষার মধ্যে সরাসরি সংযোগ বর্তমান এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাযথ রূপে সংগঠিত করলে তবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। কমিশন উল্লেখ করেছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের বাস্তবজীবনের কোনো সংযোগ নেই এবং তা মানুষের চাহিদাগুলি পূরণেও অক্ষম এবং এক্ষেত্রে তারা মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন —

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা।

(২) বৃত্তিগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা। এর পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সারা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট ধাঁচের (10+2+3) কথা বলা হয়।

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান হল একটি কর্মসূচী যা প্রারম্ভিক এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে ফাঁকাটি পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। বিগত কয়েক বৎসর থেকেই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যেসব অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ ছিল না সেখানেও বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় আর্থিক সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক প্রথমে মিজোরামে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কর্মসূচী চালু করেন। এর উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। ২০০৯ সালের মার্চ মাস থেকে এই কর্মসূচীটি শুরু হয়।

৬.২. ❑ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হবে —

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিহিত হবেন।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন নীতিগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার প্রয়োজনীয়তা কী তা বোঝা যাবে।

(ঘ) শিক্ষা অধিকার আইন কী তা বুঝতে শিখবে।

(ঙ) উচ্চশিক্ষার জন্য ও পেশাগত জীবনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন তা বুঝতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসার ও মান উন্নয়ন। প্রতিটি বসতি এলাকার ৫ কিমির মধ্যে যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকে সেটা নিশ্চিত করে দেশের কোণে কোণে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA) মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য (USE) সাম্প্রতিক একটি উদ্যোগ।

লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকাররের সর্বশিক্ষা অভিযান অনুক্রম বড়ো রকমে সার্থক হওয়ায় সারা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকাঠামো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। HRD মন্ত্রক এটা বুঝতে পেরেছে এবং তাই একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ২০,১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA) রূপায়ণ করা ঠিক করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনায় আছে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের ভালো মানের মাধ্যমিক শিক্ষা উপলভ্য, অধিগম্য ও ব্যয়সাধ্য করা। এই স্বপ্ন মনে রেখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপলব্ধ করতে হবে —

(ক) যে কোনো বসতির যুক্তি সংগত দূরত্বের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৫ কিমি এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১০ কিমির মধ্যে বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করা।

(খ) ২০১৭ (১০০%-এর GER) সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনের অভিগম্য করা এবং

(গ) ২০২০ সালের মধ্যে সবাইকে মাধ্যমিক শিক্ষার আহ্বান

(ঘ) আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণী, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণী, মেয়েদের গ্রামে বসবাসকারী অসমর্থ ছেলে মেয়েদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণী যেমন তপশিলি জাতি এবং উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (EBM) ইত্যাদি শ্রেণীর প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

৬.৩. ❑ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মনীতি এবং পরিকল্পনার রূপায়ণ (Policies and programmes for relizing the universalisation of secondary education)

মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জন্য আরও বিদ্যালয়, আরও শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য সুবিধাদির জন্য বড়ো আকারে বিনিয়োগ করা দরকার, যাতে সংখ্যা, ভরসাযোগ্যতা এবং মান বজায় রাখা যায়। সেজন্য প্রকারান্তরে পরিস্থিতি যাচাই করা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, লোকজনের প্রাপ্যতা, শিক্ষাগত তথ্য এবং অনুক্রমটির কার্যকরী দেখাশোনা দরকার। পরিকল্পনাটি প্রথমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হবে, সেটা রূপান্তরের দুই বছরের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর পর্যায় পর্যন্ত নেওয়া হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বজনীন লভ্যতা এবং তার মান উন্নত করার নীতি নিম্নরূপ—

অভিগম্যতা :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সুবিধার বেশীরকম অসুবিধা আছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এবং বেসরকারী ও সরকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও অসমতা আছে। সবাই ভালো মানের শিক্ষা পাওয়ার জন্য, জাতীয় স্তরে মোটামুটি ধাঁচ পরিকল্পনা করা বিশেষভাবে দরকার প্রতিটি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা ও জনগণের অবস্থানের কথা মনে রেখে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের তুলনামূলক মানের হওয়া উচিত। পরিকাঠামো এবং শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়ন নিম্নরূপ হবে,

বর্তমান মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রসার/নীতি পরিবর্তন।

— মাইক্রো পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সমস্ত পরিকাঠামো এবং শিক্ষকসহ উন্নীত করা। এই ব্যাপারে আশ্রম-বিদ্যালয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

— প্রয়োজন ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা।

— বিদ্যালয়ের অবস্থিতির মানচিত্রের ভিত্তিতে, যেখানে নেই সেখানে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা। এইসব বিদ্যালয়গৃহে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও অসমর্থদের সহযোগী ব্যবস্থা থাকবে।

— বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতেও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

— বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতেও অসমর্থদের বন্ধুত্বপূর্ণ করা হবে।

— নতুন বিদ্যালয়গুলিও পি পি পি ধরনের স্থাপিত হবে।

মান :

— প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন — ব্ল্যাকবোর্ড, আসবাবপত্র, পুস্তকাগার, বিজ্ঞান ও অঙ্কের পরীক্ষাগার, কম্পিউটার শিক্ষার ঘর, উপযুক্ত শৌচালয়গুচ্ছ ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে।

— বাড়তি শিক্ষক নিয়োগ এবং কার্যরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

— অষ্টম শ্রেণী পাশ করা ছাত্রদের বাড়তি শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সেতুবন্ধ পাঠ্যক্রম।

— এনসিএফ, ২০০৫ মানের সমকক্ষ হওয়ার জন্য পাঠ্যক্রম যাচাই করা।

— গ্রামে এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শিক্ষকদের জন্য বাসস্থান।

— মহিলা শিক্ষকদের বাসস্থানে ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ন্যায়পরতা :

—তপশিলি জাতি এবং উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি এবং সংখ্যালঘুদের জন্য বিনামূল্যে থাকা/খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

— মেয়েদের জন্য হস্টেল/আবাসিক বিদ্যালয়, আর্থিক সুবিধা, পোশাক, বই, আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

— মাধ্যমিক স্তরের গুণসম্পন্ন এবং গরীব ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

— সব কার্যকলাপে সর্বাত্মক শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হবে। সব বিদ্যালয়ে অন্য প্রকারে সমর্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থাকবে।

— মুক্ত এবং দূর শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষত যারা পুরো সময়ের মাধ্যমিক শিক্ষার সুবিধা নিতে পারে না তাদের জন্য মুখোমুখি নির্দেশনার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পদ্ধতিটি বিদ্যালয়ের বাইরের ছেলেমেয়েদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সম্পদ প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করা :

(১) কেন্দ্রীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে প্রতিটি রাজ্যকে বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রশাসনিক সংস্কার করতে হবে। এইসব শর্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অন্তর্গত।

(২) বিদ্যালয় পরিচালনায় সংস্কার — পরিচালন ও বাধ্যবাধকতা বিকেন্দ্রীভূত করে বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব বাড়ানো।

(৩) শিক্ষক নিয়োগ, পরিশিক্ষণ, পারিশ্রমিক, চাকুরিতে উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তিসংগত জাতীয় নীতি নির্ধারণ করা।

(৪) শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশাসনিক সংস্কার করা — আধুনিকীকরণই শাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ।

(৫) সর্বপর্যায়ে, মানে বিদ্যালয় পর্যায়ে এবং উপরে, মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত জোগানের ব্যবস্থা।

(৬) আর্থিক পদ্ধতিকে অবাধ করা, যাতে তাড়াতাড়ি এবং অনুকূলভাবে অর্থের জোগান এবং ব্যবহার সম্ভব হয়।

সম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে জোরদার করা। যেমন —

(১) জাতীয় স্তরে NCERT (RIE সমূহ সহ) NUEPA এবং NIOS.

(২) রাজ্য স্তরে SCERT সমূহ, রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয়, SIEMAT ইত্যাদি।

(৩) শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগসমূহ, প্রশংসিত বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহিত্য শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণ কলেজসমূহ (CTE সমূহ)/শিক্ষা বিষয়ে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানসহ (আই এএসই সমূহ) ইত্যাদি যার অর্থ জোগান হয় কেন্দ্রীয় সরকার পোষিত শিক্ষক শিক্ষণ পরিকল্প থেকে।

পঞ্চায়েতি রাজ এবং পৌরসংস্থা :

সম্প্রদায়, শিক্ষক, পিতামাতা এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং পিতামাতা-শিক্ষক সংস্থা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান, পরিকল্পনা পদ্ধতি, রূপায়ণ, দেখাশোনা এবং মূল্যায়ন করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার চারটি কেন্দ্রীভূতভাবে পোষিত পরিকল্প চালাচ্ছে। যথা —

(১) বিদ্যালয় আই সি টি- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা ও কম্পিউটার সহযোগে শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারসমূহকে সহায়তা দিচ্ছে।

(২) অসমর্থ ছেলেমেয়েদের সমন্বিত শিক্ষা (আই ই ডি সি)-অসমর্থ ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ,সমন্বিত শিক্ষার্থীদের সমাজের মূলস্রোতে আনার রাজ্য সরকার ও এনজিওসমূহকে সহায়তা দেওয়া।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য বোর্ডিং ও হস্টেল (লভ্যতা এবং ন্যায়পরতা) ব্যবস্থা করা। এনজিওগুলিকে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের হস্টেল চালানোর জন্য সহায়তা দেওয়া হয়।

(৪) বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন, যার মধ্যে পড়ে বিদ্যালয়ে যোগাভ্যাস প্রবর্তনের জন্য, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিবেশ এবং জনগণ সম্পর্কিত শিক্ষার জন্য, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডেও যোগদানের জন্য রাজ্য সরকারকে সহায়তা দেওয়া। এইসব পরিকল্পনা একইরকমভাবে বা পরিবর্তিতভাবে নতুন পরিকল্পে কোনো বিশেষ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৫) আর্থিকভাবে ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সাথে সাথে উপার্জন করার ব্যবস্থা করে স্বনিযুক্তির জন্য তাদের প্রস্তুত করা। রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ব্লক বা জেলা স্তরে পেশাগত শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যলয়সমূহ এবং জওহর নবোদয়সমূহ :

পথ দেখানো বিদ্যালয় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং আরও জোরদার করা হবে।

অর্থ যোগানোর ধারণা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা (Financing pattern and opening Bank Account) :

(১) ১১ তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে উত্তর-পূর্ব, রাজ্যগুলি ছাড়া সব রাজ্যাঞ্চলের কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পের সমস্যাটা রূপায়ণের খরচের ৭৫% বহন করবে (যেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে খরচ ভাগাভাগি হওয়ার কথা)। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার খরচের ৭০% বহন করবে।

(২) রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ, ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্ত খরচের ২৫% বহন করাবে (যেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ জোগান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার কথা)। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি এই ধরনের খরচের ১০% বহন করবে।

(৩) রাজ্য সরকার অর্থ সংক্রান্ত পরিচালনার জন্য, অর্থ হস্তান্তর ও বর্তমান এস এস এ-র মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য একটা ব্যাপক পদ্ধতি পরিকল্পনা করবে। তাতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে এবং শেষে ফলের জন্য কীভাবে অর্থ খরচ হল তার খোঁজ রাখতে হবে।

৬,৪. ❑ শিক্ষা অধিকার আইন (Right to Education Act)

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এটা সমাজের উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৭ দ্বারা ভারতীয় সংসদ ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়স-এর সমস্ত শিশুকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে। এই আইন বলবৎ করবে আইনগতভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি প্রদান করবে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

আইনের পটভূমি (Background to the Act) :

১৯৫০ সালে ভারতের রাজ্যনীতি নির্দেশিকা মূলনীতি নিবন্ধটি ৬-১৪ বছরের সমস্ত শিশুকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা উপলব্ধ করার সাংবিধানিক অঙ্গীকার করেছেন। ২০০২ সালের ১২ই ডিসেম্বর আর্টিকেল 12A মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষা অধিকার চালু করার জন্য সংশোধিত হয়েছে। বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন শিশুদের অধিকার অবশেষে ১লা এপ্রিল ২০১০ এই আইনের বাস্তবায়ন হয়। এটা ভারতবর্ষের শিক্ষা ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই আইনের দেখাশোনা ও সম্পাদনের দায়িত্বভার অর্পিত হয় The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) উপর। এই সংস্থা এই কাজের দায়িত্ব পালন-এর জন্য নতুন বিভাগ স্থাপন করে।

আইনের মুখ্য বিধানসমূহ (Main Provision of the Act) :

(১) ১৪ বছর বয়সের মধ্যে সকল শিশুর জন্য এলাকার স্কুলে বিন্যামূলে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

(২) এই আইন বলে বাধ্যতামূলক শব্দটি সরকারের জন্য প্রযোজ্য। অভিভাবকদের দায়িত্ব শিশুকে বিদ্যালয়ের বাইরের বা বিদ্যালয়ছুট সমস্ত শিশুকে চিহ্নিত করা।

(৩) বিদ্যালয়ে সকল শিশুর নাম নথিবদ্ধ করাকে সুনিশ্চিত করা।

(৪) বিদ্যালয়ে সকল শিশুর নিয়মিত উপস্থিতির হার সুনিশ্চিত করা।

(৫) সকল শিশু প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা শেষ করল কিনা তা দেখা।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষাতে কোনো শিশু কোনো ফি, কোনো চার্জ, খরচ দিতে বাধ্য নয়। শিশুকে বিনা খরচে শিক্ষা দিতে হবে।

(৭) ছয় বছরের উপরে একটি শিশুকে যদি কোনো স্কুলে ভর্তি করা হয় - সেখানে তার উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) এই আইন প্রবর্তন থেকে তিন বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণ করতে হবে।

(৯) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই আইনের বিধানগুলি পূরণকল্পে তহবিল জোগান দেওয়ার জন্য সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আইনের বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ন্যাশানাল কাউন্সিল (NCERT) অ্যাকাডেমিক কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম বিকাশের রূপরেখা তৈরী করেছে। এই আইনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের এগিয়ে দেওয়া।

এই আইনে যাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেমন শিশুশ্রমিক, অভিবাসী শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, ভাষাগত, লিঙ্গগত দিকে অনগ্রসর গোষ্ঠীর মানুষদের জন্য।

৬.৪.১. ❑ Right to Education and its implications for Universalisation of Secondary Education

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সার্বিক সাফল্যের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের যুব

সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এটি উচ্চশিক্ষার প্রবেশপথ স্বরূপ। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, জীবনের মানোন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে এই শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য নিম্নলিখিত স্কিমগুলি (IX-XII) 14 -18 বছরের সকল তরুণ-তরুণীকে সাশ্রয়ীমূল্যে ভালোমানের মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্পনসরড প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে 14 - 18 বছরের সকল তরুণ-তরুণীদের সাশ্রয়ী মূল্যে ভালোমানের মাধ্যমিক শিক্ষা করা।

বর্তমানে নিম্নলিখিত দিকগুলি (Class IX-XII) কেন্দ্রীয় স্পন্সরড প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(1) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA)।

(2) মডেল বিদ্যালয় প্রকল্প (Model School Scheme)।

(3) মেয়েদের হোস্টেল প্রকল্প (Girl's Hostel Scheme)।

(4) আই.সি.টি স্কুল (ICT School)।

(5) সেকেণ্ডারী পর্যায়ে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stages)।

(6) বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রকল্প (Scheme of Vocational Education)।

(7) ন্যাশানাল উপায় তথ্য মেধা বৃত্তিপ্রকল্প (National means-cum-merit Scholarship Scheme)।

(8) ভাষা শিক্ষক নিয়োগ (Appointment of Language Teacher)।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA) :

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রকে উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে ২ মার্চ ২০০৯ সালে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-২০১০ থেকে শুরু এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে ৫ বছরের মধ্যে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (২০১৭-মধ্যে) শিক্ষা সর্বজনীন করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার। লিঙ্গ, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অক্ষমতা বাধা অপসারণ করতে হবে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শিক্ষার গুণগত উন্নতি করতে হবে। এই পরিকল্পনায় ২০০০ সালের মধ্যে সর্বজনীনভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে।

এই প্রকল্পে প্রদত্ত অধীন গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা (Important Physical Facilities Provided under Scheme) :

(১) অতিরিক্ত ক্লাস রুম, (২) ল্যাবরেটরিজ, (৩) লাইব্রেরি, (৪) শিল্প ও কারু শিল্প রুম, (৫) টয়লেট ব্লক, প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষকদের জন্য। (৬) পানীয় জলের ব্যবস্থা, (৭) আবাসিক হস্টেল।

এই প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ হস্তক্ষেপ (Important quality interventions Provided under the Scheme) :

(ক) ৩০:১ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কমাতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ; (PTR), (খ) বিজ্ঞান গণিত ও ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপাত, (গ) চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, (ঘ) বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিজ, (ঙ) আইসিটি সক্রিয় শিক্ষা নেভিগেশন ফোকাস, (চ) পাঠ্যক্রমের সংস্কার, (ছ) শিক্ষণ শিক্ষার সংস্কার।

প্রকল্প প্রদত্ত হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ইকুইটি (Important quality interventions Provided under the Scheme) :

(১) মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, (২) () সংখ্যালঘু-ঘনত্ব এলাকায় স্কুলের বিশেষ গুরুত্ব এবং আপগ্রেডেশন, (৩) আশ্রম স্কুলগুলিতে মাইক্রো পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব; (৪) বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা টয়লেট স্থাপন, (৫) মেয়ে-শিশুদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্লক স্থাপন, (৬) বিদ্যালয়ে বেশি মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ।

প্রকল্প বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়া (Implementation Mechanism of the Scheme) :

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের দ্বারা এই প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সেবায় সরাসরি রূপায়ণকারী সংস্থা যুক্ত হয় ; প্রযোজ্য রাজ্য শেয়ার ছাড়াও নিজ নিজ রাজ্য সরকার দ্বারা রূপায়ণকারী সংস্থা যুক্ত হয়।

বালিকা ছাত্রাবাস প্রকল্প (Girls' Hostel Scheme) :

এটি ২০০৮-০৯ সালে চালু হল। এটি একটি নতুন কেন্দ্রীয় স্পনসর্ড প্রকল্প। প্রতিটি ব্লকে পিছিয়ে পড়া এলকায় স্কুলগুলিতে ১০০ বেডের বালিকা হস্টেল প্রতিষ্ঠাকরণ। ২০০৯-১০ থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্প। এই বালিকা হস্টেল চালানোর সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল-যার অধীনে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রদের জন্য হস্টেল নির্মাণ এবং চালানোর জন্য (NGO) চালিত প্রকল্প প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

জাতীয় তথা মেধা বৃত্তি প্রকল্প উপায় (National means cum Merit Scholarship Scheme) :

কেন্দ্রীয় স্পন্সর্ড প্রকল্প ''জাতীয় পদ্ধতি তথা মেধা বৃত্তি প্রকল্প (NMMSS)'' চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) এবং তাদের অধ্যয়নে উৎসাহিত করা এবং অর্থনৈতিক দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পুরস্কার দেওয়া। প্রতি বছরে ৬০০০০ টাকা (মাসে ৫০০০ টাকা) ছাত্র প্রতি। সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য প্রতি বছর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য স্কলারশিপ চালু করেছে। যাদের পিতা-মাতার বার্ষিক আয় ১,৫০,০০০ টাকার বেশি নয় সেইসব ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপ পেতে যোগ্য; কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী অন্বেষণ এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করছে। এটা একটা জাতীয় উন্নয়ন। এছাড়া জাতীয় প্রতিভা খোঁজা পরীক্ষার (NTSE) মাধ্যমে বৃত্তিপ্রদানে ছাত্রদের নির্বাচন করা হয়। ২০১৩-১৪ অ্যাকাডেমিক বছরে NMMSS বৃত্তির জন্য ছাত্রদের নির্বাচনের

আলাদা পরীক্ষা রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃত্তি সরাসরি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে।

সেকেন্ডারী স্কুলের সমন্বিত শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য (Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage - IEDSS) :

IEDSS প্রকল্প ২০০৯-১০ সাল থেকে চালু করা হয়েছে প্রতিবন্ধী শিশুদের (IEDC) জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প আগে প্রতিস্থাপন এবং একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবন্ধী সমন্বিত শিক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

লক্ষ্য :

একটি সমন্বিত এবং সক্রিয় পরিবেশে এলিমেন্টারি স্কুল আট বছর সম্পন্ন করে তারপর প্রতিবন্ধীদের স্কুলে ভর্তিকরণ।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

জাতীয় ট্রাস্ট আইন (১৯৯৯) সাপেক্ষে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নবম শ্রেণীর প্রতিবন্ধী বিদ্যার্থী, যেমন, অন্ধ, ক্ষীনদৃষ্টি, মুক ও বধির, কুষ্ঠ মানসিকভাবে অসুস্থ, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, শিখনে অক্ষম ইত্যাদি বিদ্যার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বদান এবং মাধ্যমিক স্তরের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলি পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মানোন্নয়ন ঘটানো।

সামগ্রী উপাদান (Components) :

সাপোর্ট সার্ভিস, সহকারী ডিভাইস, বোর্ডিং, থেরাপিউটিক সেবা অধ্যায়ন উপকরণ ইত্যাদি চিকিৎসা, শিক্ষা মূল্যায়ন বই ও স্টেশনারি, ইউনিফর্ম, পরিবহন ভাতা, পাটক ভাতা ইত্যাদি।

এছাড়া ছাত্রভিত্তিক উপাদান এবং অন্যান্য উপাদান বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগে যেমন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সাধারণ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর স্থিতিবিন্যাস, রিসোর্স রুম প্রতিষ্ঠা, বাধামুক্ত পরিবেশ প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

সংস্থা প্রবর্তনকারী (Implementing Agency) :

রাজ্য সরকার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসকদের স্কুল শিক্ষা বিভাগ রূপায়ণকারী সংস্থা। তারা প্রকল্পের বাস্তবায়নে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন NGO-গুলিকে মুক্ত করতে পারে।

আর্থিক সহায়তা (Financial Assistance) :

প্রকল্পের মধ্যে আবৃত্ত সমস্ত আইটেমের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তার ১০০ শতাংশ ভিত্তিতে হয়। রাজ্য সরকার শুধু স্কলারশিপের জন্য টাকা প্রদান করবে। বার্ষিক অক্ষম শিশুদের ৬০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে।

মডেল বিদ্যালয় প্রকল্প (Model School Scheme) :

2008 খ্রিস্টাব্দে মডেল বিদ্যালয় স্থাপনা শুরু হয়। প্রতিভাবান গ্রামীন শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষাপ্রদান করার লক্ষ্যে স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল —

(i) প্রতি ব্লকে অন্তত একটি উন্নতমানের সিনিয়র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

(ii) এই বিদ্যালয়গুলি পেস সেটিং স্কুল হবে — to have a pace setting roles ।

(iii) পেস-সেটিং বিদ্যালয়গুলিতে উদ্ভাবনী পাঠক্রম অনুসরণ করা হবে।

(iv) আধুনিক উন্নত পরিকাঠামো, পাঠক্রম, মূল্যায়ন এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও পরিচালনা এমন হবে যাতে স্কুলগুলি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সামনে উদাহরণস্বরূপ হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন দুটি মোড আছে। যেমন 3500 স্কুলের রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারের মাধ্যমে অনেক শিক্ষাগত অনগ্রসর ব্লকের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এবং অবশিষ্ট 2500 স্কুলের ব্লকে সরকারি বেসরকারী সহযোগিতা (পি পি ডি) মোড অধীনে সেট আপ করা হয়। যা শিক্ষাগত দিকে উন্নিত। রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারের মাধ্যমে EBBS মডেলে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজ্য সেক্টর কম্পনেন্ট অনুন্নত থেকে সূচিত করা হয়েছে এমন ব্লকে মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য PPP উপাদানের (2009 -10) ও বাস্তবায়ন থেকে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশনে মেয়েদের জন্য ইনসেনটিভ (Incentives of Girls' for Secondary Education) :

১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েরা যারা অষ্টম শ্রেণী পাশ করেছে সেইসব মেয়েদের এই তালিকাভুক্ত করা, এটা একটা কেন্দ্রীয় স্পনসরড উৎসাহ প্রকল্প। সেকেন্ডারী এডুকেশন মেয়েদের ইনসেনটিভ জাতীয় প্রকল্প ২০০৪ সালে মে মাসে চালু হয়েছিল।

প্রকল্পে রয়েছে (The Scheme Covers) :

(১) অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং যারা SC/ST মেয়ে।

(২) কস্তুরবা গান্ধি বালিকা বিদ্যালয় (SC/ST) থেকে ক্লাস অষ্টম পাশ করা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারের স্কুলের নবম (IX) শ্রেণীর নথিভুক্ত মেয়েরা এবং সরকার এডেড বা স্থানীয় স্কুলের ২০০৮-০৯ সালে অ্যাকাডেমিক বছরের মধ্যে অগ্রে থাকবে।

(৩) মেয়েরা ক্লাস IX (নবম) শ্রেণীতে পড়বে এবং বয়স ১৬ বছরের নীচে হতে হবে (Below 16 years of age as on 31st March)

(৪) বিবাহিত মেয়ে, জাতিসংঘের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে অধ্যয়নরত মেয়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চালানো স্কুলের মধ্যে নাম নথিভুক্তকরণ বহির্ভুক্ত এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

(৫) যোগ্য বালিকাদের নামে ৩০০০ টাকা ফিক্সড ডেপোজিট করে দেওয়া হবে এবং ১৮ বছর বয়স হলে ঐ টাকা তুলতে পারবে মেয়েরা।

(৬) সম্প্রতি রাজ্য সরকার কন্যাশ্রী পুরস্কার চালু করেছে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ মেয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাসে মাসে টাকা পাবে। এবং এককালীন ২৫০০ টাকা পাবে HS পাশ করার পর।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্প (Scheme of Vocational of Secondary Education) :

- উন্নত চাহিদা ও দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের মধ্যে ফারাক কমতে এবং উচ্চতর শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী বিদ্যার্থীদের জন্য একটি বিকল্প পথ হিসাবে সরকার এই প্রকল্প প্রবর্তন করে।
- Vocationalization of Secondary Education প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হয় 1988 খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং সংশোধিত প্রকল্প চালু হয় 1992 - 93 থেকে।
- প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো, এলাকার বৃত্তিমূলক সার্ভে, পাঠক্রমের প্রস্তুতি, পাঠ্যবই, পাঠক্রম গাইড, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ গবেষণা, শক্তিশালী প্রযুক্তিভিত্তিক সহায়তা সিস্টেম ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়।
- বর্তমানে সারা ভারতে দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 9619 টি বিদ্যালয়ে 150 টি বৃত্তিমূলক কোর্স চালু আছে।
- এই প্রকল্পটিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ভাষা শিক্ষক নিয়োগের জন্য আর্থিক সহায়তা (Financial Assistance for Appointment of Language Teachers) :

স্কুলের শিশুদের মধ্যে ইংরাজি ছাড়া হিন্দি, উর্দু ভাষায় উৎসাহিত করা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় উৎসাহিত করা। ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুলে ভাষা শিক্ষক নিয়োগের জন্য আর্থিক সাহায্য পরিকল্পনা চালু করছে। এই প্রকল্প সরকারী স্কুল, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের প্রয়োজন পূরণ করবে। জাতীয় ভাষা প্রচারের পাশাপাশি উর্দু, কানাড়ি, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগুর মতো আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পে তিনটি অংশ আছে। এটার জন্য উপলব্ধ করা হয় —

(১) অ-হিন্দিভাষীদের মধ্যে হিন্দি শিক্ষক।

(২) সংখ্যালঘু এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জেলা স্কুলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ।

(৩) রাজ্য সরকার/UST বলতে হিন্দি স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা শেখানোর জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষকদের প্রদান।

হিন্দি শিক্ষক নিয়োগ এবং হিন্দি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান —

(১) হিন্দি শিক্ষক নিয়োগ।

(২) রাজ্য সরকারের সহায়তায় হিন্দী শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ সুদৃঢ়করণ, অ-হিন্দিভাষীদের মধ্যে ত্রিভাষা সূত্র কার্যকর করা।

এই পরিকল্পনার আওতায় উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি শিক্ষক পোস্ট অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসকদের দেওয়া হয়েছে হিন্দি শিক্ষক প্রশিক্ষণের নির্দেশ। কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। হিন্দি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ খোলা হচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে যেখানে উর্দু পড়ানো হয় সেখানে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ এবং গ্রান্ট-ইন-এডের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

উর্দুভাষা প্রচারের জন্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার উর্দু শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্পন্সর প্রকল্প শুরু করেছে। উর্দু শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু এলাকার প্রতিষ্ঠানের উর্দু শিক্ষকের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সরকারী, সরকারী সাাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে উর্দু শিক্ষার জন্য উর্দু শিক্ষক নিয়োগ এবং তাঁর বেতনের জন ১০০% আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে সংখ্যালঘু এলাকা যেখানে ২৫% জনগণ উর্দুভাষী সেখানে সংখ্যালঘু কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর নতুন ১৫ point কর্মসূচী জ্ঞাপন। উর্দু শিক্ষক নিয়োগের বেতন দেবে রাজ্য সরকার। উর্দু শিক্ষকদের ট্রেনিং ৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে।

(1) Jamia Milia Islamia University (JMIU).

(2) Aligar Muslim University (AMIU).

(3) Moulana Azad National Urdu University (MANUU).

কৈশোর শিক্ষা কর্মসূচী (Adolescence Education Programme) :

- কিশোর-কিশোরীদের উন্নতজীবনের জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় Adolescence education programme প্রবর্তন করেন।
- বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলা, ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা, দ্বায়িত্বশীলভাবে বাস্তবে জীবন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে।
- জাতীয় জনশিক্ষা কর্মসূচী (NPEP) মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বায়িত্বশীল আচরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিকাশের লক্ষ্যে NPEP থেকে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলে কৈশোরের রিপ্রোডাকটিভ এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিদ্যার্থীদের স্মার্ট জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। NCERT, CBSE, UNEPA এবং একই জাতীয় সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। কৈশোর শিক্ষা-প্রোগ্রাম সমন্বয় সংস্থা (AEP), ন্যাশানাল ওপেন স্কুল (NIOS), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংস্থা (KVS) এবং নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি ইত্যাদি কৈশোর শিক্ষা কর্মসূচী রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

৬.৫. ❑ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা (Status of USE)

৬.৫.১. ❑ প্রবেশাধিকার এবং তালিকাভুক্তি (Access and Enrolment)

An area intensive approach ensuring convergences of educational and developmental activities, resource inputs by variuos agencies and government departments community participation in education endeavours.

(১) একটি এলাকায় নিবিড় পদ্ধতির শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা সম্পদ ইনপুট Convergences নিশ্চিত, শিক্ষাগত চেষ্টা সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ।

(২) শিক্ষাগত অনগ্রসর এলাকায় এবং জনসংখ্যা যাতে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষার Inequalities (পক্ষপাত/অবিচার) হ্রাসকরণ।

(৩) উচ্চমানের সরকারী স্কুলের শিক্ষাগত অনগ্রসর সংখ্যালঘুদের ঘনত্ব সব এলাকায় স্থাপন করা উচিত।

(৪) মেয়ে শিশুদের জন্য দ্বিতীয় একচেটিয়া এবং উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। এই স্কুল শিক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে মেয়েদের উচ্চতর অংশগ্রহণ সহজতর হবে।

(৫) রাজ্য সরকার উচ্চতর প্রাথমিক স্কুলের আপগ্রেডকরণ একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বিদ্যালয়। সংখ্যালঘু ঘনত্ব এলাকায় স্থাপন করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আশা করা যায়। শতাংশ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(৬) Co-education স্কুল-এ আরও নারীশিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৭) শিক্ষাগত প্রাপ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করা দরকার।

(৮) নিয়মিত তালিকাভুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ (Regular enrolment drives)।

(৯) তাদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প ও সেতু কোর্স সম্পন্ন।

(১০) মুক্ত এবং দূরবর্তী শিখন।

(১১) ধর্মীয় নির্দেশ মোতাবেক মক্তব এবং মাদ্রাসা কেন্দ্রগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথাগত স্কুলগুলির সুবিধা প্রদান করা।

(১২) প্রতিরোধী গ্রুপ মধ্যে নিবিড় Mobilization (সংহতি) প্রচেষ্টা।

(১৩) Working in close collaboration with the community in mobilizing parents in identified pockets.

(১৪) স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ব্যবহার করে সম্প্রদায়ের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখা।

(১৫) ছাত্রাবাসের সুবিধা প্রদান করা।

৬.৫.২. ❑ ধারণ ক্ষমতা (Retention)

(১) নিবিড় কার্যকলাপের জন্য চিহ্নিত পকেটের মধ্যে পর্যবেক্ষণ উপস্থিতি।

(২) Provision of some token awards grades or incentives if possible for better attendance.

(৩) ভালো অ্যাকাডেমিক এবং উপস্থিতি রেকর্ড শিশুদের সর্বজনীন সুবিধা।

(৪) বৃত্তি প্রদান করা।

(৫) Organization of on regular internals retention drives to put regular pressure on parents and the schools system to ensure retention of girls. These are not one time drives but one organized at regular intervals to sustain the pressues and take up corrective measures as may be necessary.

৬.৫.৩. ❑ অর্জন করা (Achievement)

(১) শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর সংখ্যালঘু বালিকা এবং শিশু যারা শিক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে তাদের জন্য স্পেশাল কোচিং ক্লাস এবং রেমিডিয়াল কোচিং-এর ব্যবস্থা করা।

(২) তাদের শিখতে সুযোগ দেওয়া হয় এমন পরিবেশে যেখানে শ্রেণীকক্ষে একটি উপযুক্ত শিখন (Congenial Learning) পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(৩) হয়তো একই জন্য যথেষ্ট চাহিদা থাকার স্কুলে সহজতর নির্দেশ একটি মাধ্যম হিসাবে উর্দু।

(৪) শিক্ষকের প্রতি সংবেদনশীলতা কর্মসূচী।

(৫) উর্দু শিক্ষক স্থাপনার/বিস্তার।

৬.৫.৪. ❑ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ (Scheme for Universal Access and quality at the second stage)

Success-এর মূল লক্ষ্যগুলি হল —

(১) ভর্তি, ড্রপ আউট ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ নীতিকে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া বা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য করা।

(২) বিজ্ঞান ও অঙ্কে জোর দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ :

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে জাতীয় পাঠ্যক্রম তৈরী ২০০৫ নীতি গ্রহণ বা NCF ২০০৫, NET-SET পরীক্ষা গ্রহণ এবং NCERT, CBSE, SCSE, SCERT এবং বিভিন্ন রাজ্য বোর্ডের মতো প্রশাসনিক সংস্থার গ্রহণযোগত্যা বাড়ানো। উপরিউক্ত

পদক্ষেপ কার্যকর হলে উন্নতমানের অধ্যাপকবর্গ বা শিক্ষক নিযুক্তিকরণ, বিদ্যালয় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী অমীমাংসিত প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সংস্করণ এবং সমস্ত ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব দান বা কৈফিয়ত প্রদান সুনিশিতকরণ সম্ভবপর হবে।

৬.৬. ❑ সংক্ষিপ্ত সার (Summing Up)

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসার ও মান উন্নয়ন। প্রতিটি এলাকায় ৫ কিমি-এর মধ্যে যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকে তা নিশ্চিত করে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটবে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের সর্বশিক্ষা অভিযান বড়োরকমের সার্থক হওয়ায় সারা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকাঠামো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার নিরপেক্ষতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য সমস্ত বিদ্যালয়, বিনা সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয় সহ, অবহেলিত সমাজের এবং দারিদ্র সীমার নীচে প্রচুর ছেলেমেয়েকে ভর্তি করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জন্য আরও বিদ্যালয়, আরও শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য সুবিধাদির জন্য বড়ো আকারে বিনিয়োগ করা দরকার যাতে সংখ্যা, ভরসাযোগ্যতা এবং মান বজায় রাখা যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সুবিধার বেশিরকম অসুবিধা আছে। বেসরকারী ও সরকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অসমতা আছে। সবাই ভালো মানের শিক্ষা পাওয়ার জন্য জাতীয়স্তরে পরিকল্পনা করা বা নীতি নির্ধারণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মাইক্রো পরিকল্পনা করা বা নীতি নির্ধারণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মাইক্রো পরিকল্পনা অনুসারে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালগুলিকে সমস্ত পরিকাঠামো এবং শিক্ষকসহ উন্নীত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই ব্যাপারে আশ্রম বিদ্যালয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন — ব্ল্যাকবোর্ড, আসবাবপত্র, পুস্তকাগার, বিজ্ঞান ও অঙ্কের পরীক্ষাগার, কম্পিউটার শিক্ষার ঘর, উপযুক্ত শৌচালয়গুচ্ছ ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি এবং উপযুক্ত সংখ্যালঘুদের জন্য বিনামূল্যে থাকা/খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা অধিকার আইন ৬-১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে। IEDSS প্রকল্প ২০০৯-১০ সাল থেকে চালু করা হয়েছে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষাপ্রকল্প আগে প্রতিস্থাপন এবং ক্লাস একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবন্ধী সমন্বিত শিক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

৬.৭. ❑ প্রশ্নাবলী (Questions)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?

(২) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কী?

(৩) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ২টি স্বপ্ন (Vision) উল্লেখ করুন।

(৪) শিক্ষা অধিকার আইন কী?

(৫) জাতীয় মেধা বৃত্তি প্রকল্প কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) সেকেন্ডারী স্কুলের সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ আলোচনা করুন।

(২) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান সম্পর্কে টীকা লিখুন।

(৪) বর্তমানে বিশেষ কোন বিষয়গুলি (ক্লাস IX-XII) কেন্দ্রীয় স্পন্সরড প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে?

(৫) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার মান কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(২) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য চারটি নীতি আলোচনা করুন।

(৩) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৪) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

(৫) শিক্ষার অধিকার আইনের মুখ্য বিধানসমূহ আলোচনা করুন।

৬.৮. ❑ উৎস (Reference)

১. Banerjee J.P. – Education in India: Past, Present and Future.

২. Chakroborty S.C. – Modern Indian Eduaction.

৩. Banerjee S.N. – History of Education in India.

৪. ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা – সরোজ চট্টোপাধ্যায়।

৫. সাম্প্রতিককালীন ভারতীয় শিক্ষার ধারা – ড. দেবাশিষ পাল, ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, হামিদুল হক।

৬. শিক্ষা ও সাম্প্রতিক সমস্যাবলী – ড. জয়ন্ত মেটে, ড. বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ, ড. রুমা দেব।

একক : ৭

শান্তি শিক্ষা

(PEACE EDUCATION)

গঠন ❑ (Structure)

৭.১ সূচনা

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ শান্তি শিক্ষার অর্থ ও ধারণা

৭.৪ শান্তি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭.৪.১ শান্তি শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি

৭.৪.২ শান্তি শিক্ষার বাধাসমূহ

৭.৫ Relevance of peace : National and International Context

৭.৫.১ পঞ্চশীল

৭.৬ শান্তির অগ্রগতিতে শিক্ষকের ভূমিকা

(National Knowledge commission)

৭.৭ সারসংক্ষেপ

৭.৮ প্রশ্নাবলী

৭.৯ উৎস (References)

৭.১ সূচনা (Introduction) :

শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এমন কী রাজনৈতিক মূল্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমেই সমস্ত রকম সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করেও রাখা যায়। প্রত্যেক প্রজন্মই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা সঞ্চালনের অগ্রদূত। বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক ন্যায় পরতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে সেগুলির বাস্তব প্রয়োগই হল শান্তি। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য সঞ্চালন ও সঞ্চারণের জন্য শিক্ষক মেলবন্ধক হিসাবে কাজ করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করার জন্য। তৃণমূল স্তর থেকে শান্তি গড়ে তুলতে হবে এবং যার একমাত্র মাধ্যম হল শিক্ষা। শান্তি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে হতাশা, মতবিরোধ দূর করে, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথ প্রদর্শন করে ও সকলকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসে সমগ্র এবং অংশের মধ্যে সংগতিবিধান করে। তাই বলা হয় Peace should be thought of the process of mans adjustment to his nature, his fellows, and to the ultimate nature of the world." বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য UNO, UNESCO, UNICEF, IRC (International Red cross) প্রভৃতি সংস্থা এবং Non-alignment movement, Green Peace Movement Pacifist Movement প্রভৃতি উদ্দ্যোগ অনস্বীকার্য। আন্তরিকতা, বিশ্বাস, সত্যতা, ভালোবাসা প্রভৃতি শান্তি রাজ্যে অবিচ্ছেদ্য উপাদান-যার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে শান্তির বাতাবরণ।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে—

(ক) শান্তির শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(খ) শান্তি শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে অভিহিত হবে।

(গ) শান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কতটুকু তা জানবে।

(ঘ) শান্তি শিক্ষা বিভিন্ন গুণের বিকাশ কীভাবে হয় তা বুঝতে সাহায্য করবে।

(ঙ) সমগ্র বিশ্বে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা উপলব্ধি করবে।

৭.৩ শান্তি শিক্ষার অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Peace Education) :

সামজিক সংগতিবিধান, বৈচিত্রপূর্ণ জীবন যাপনই হল শান্তির মূল বাতাবরণ। শান্তি বলতে মূলত বোঝায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের সাংস্কৃতিক ও নৈতিকতার উন্নতিকে। সহমর্মিতা, সহানুভুতি, আত্মসংযম, উৎসর্গ, জনসেবা, নৈতিকতা, ব্যক্তিসমাজের কল্যাণ সাধন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তি বলতে বোঝায় আত্মার শান্তি সমাজের শান্তি এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তি যেটি ব্যক্তি মানুষের আন্তরিক

উদ্যোগের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। শান্তি হল ''Self Culture Or Self Development of each and every Individual of the Society emphasis on moral elevation.'' ''আরও বলা যায় The Basis meaning of peace is a narmonious, socially, adjustable and mutually cooperative peaceful life style.''

অন্যদিকে শিক্ষা হল সামাজিক সংগতিবিধানের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্থক অভিযোজনে সক্ষম হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Dumvile বলেছেন ''Education in its widest sense include all the influences which act upon and individual during his passage from cradle to grave.'' অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়ে সবই তার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সামাজিক জীব এবং এই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্যই ব্যক্তি মানুষ শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করে। ব্যক্তি শিক্ষার্জন করে মূলত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সমাজের রীতিনীতি আচার-আচরণ, প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার জন্য শিক্ষা ব্যক্তিকে উপযোগী করে তোলে। শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার স্বরূপ। মানুষের জীবন পরিবেশে তাকে সব সময় সামাজিক আবহের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে হয়।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে একজন ব্যক্তি কখনই নিজের চেষ্টায় সামগ্রিক পরিবেশ পরিবর্তিত করতে পারে না। অন্যের সহায়তা তার প্রয়োজন হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়াই সেই ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার সাহায্যেই ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখে এবং সমাজ তথা সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যই হল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল ব্যক্তির সমগ্র গুণাবলীর বিকাশসাধন করা। যার মধ্যে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বলা যায় ''শান্তি শিক্ষা হল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক জীবন যাপনের জ্ঞান অর্জন করে। শান্তি শিক্ষা হল মানুষ গড়ার শিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলী প্রকাশিত হয়।''

শান্তি শিক্ষা হল দক্ষতার শিখন। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দক্ষতাসম্পন্ন সমাজ গড়ার কারিগর তৈরী করা যারা সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করবে।

শান্তি শিক্ষা হল সামগ্রিক শিক্ষা, যা ব্যক্তির দৈহিক, প্রক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। ভালোবাসা, সহানুভূতি, সভ্যতা স্বচ্ছতা, সহযোগিতা, সুন্দর সমাজ ও সবুজ পৃথিবীর প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ভালোবাসা এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর শান্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Dr. M. Roy বলেছেন, ''যে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় বিচার, মানব অধিকার, গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবেশগত সচেতনতা উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সেই শিক্ষাই হল শান্তি শিক্ষা।''

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শান্তি শিক্ষা হল সামাজিক সংগতি বিধানের সেই প্রতিকার যার মাধ্যমে সমাজের হিংসার পথ থেকে শিক্ষার্থীদের অপসারণের উপায়। যার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন করা। শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ জন্ম দেয়। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন এক মূল্যবোধ গড়ে তোলে যার মাধ্যমে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়। UNESCO শিক্ষার যে চারটি লক্ষ্য নির্ণয় করে তার মধ্যে learning to live together এবং learning to be পরোক্ষভাবে শান্তি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৭.৪ শান্তি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : (Aims and objectives of peace Education)

Peace Education বা শান্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করা। শান্তি যেমন শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেয় তেমনি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। শান্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক ''Reardon'' বলেছেন ''To provide knowledge and skill as well as capacities and commitment to overcome obstacles to peace and to build a global community encompasses the entire human family and accords equal value and fuldignity of all human beings.'' সমগ্র বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরীর উদ্দেশ্য এই শিক্ষার লক্ষ্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) শান্তি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা এই শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

(খ) শান্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সংকীর্ণ মনোভাব দূর করে ব্যক্তিকে সমাজ ও দেশের উপযোগী করে তোলে।

(গ) ব্যক্তির চিন্তন শক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রভৃতি বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ আসনে উন্নীত করা।

(ঘ) শান্তি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মূল্যবোধ গড়ে তোলা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(ঙ) ব্যক্তিকে চরিত্রবান ও হৃদয়বান করে গড়ে তোলাও এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(চ) শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

(ছ) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা, সামাজিক সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করাও এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

(জ) ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(ঝ) ব্যক্তির মধ্যে সুভাস গড়ে তোলা এই শিক্ষার লক্ষ্য।

(ঞ) সমাজ তথা দেশকে যুদ্ধ হিংসার গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসা এই শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

(ট) ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে অভিযোজন করতে সাহায্য করা।

(ঠ) ব্যক্তিকে জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের উন্নীতকরণ এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(ড) ব্যক্তিকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব ধর্মী জ্ঞান দান করে সমাজের উপযোগী করে তোলা।

শান্তি শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Peace Education) :

শান্তি শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, শান্তপ্রিয় হল শান্তি শিক্ষার প্রকৃতি ও শান্তির বাতাবরণ নিয়ে আলোচনা হয় শিক্ষা শিক্ষায়। শান্তি শিক্ষার মাধ্যমে যেহেতু ব্যক্তির চারিত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক ইত্যাদি সমস্ত দিকের সুষম বিকাশ ঘটে, তাই এই শিক্ষার প্রকৃতির মধ্যে উক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত বলে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

১। **সর্বজনীন শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষা একটি সর্বজনীন শিক্ষা প্রক্রিয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এই শিক্ষা উন্মুক্ত যেকোনো মেধার শিশুই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নিজের সামর্থ, চাহিদা, প্রবণতা অনুযায়ী শিশুরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২। **অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা :** ব্যক্তিকে তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৩। **ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধান :** শান্তি শিক্ষা ব্যক্তিত্ব সহায়ক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এবং একজন নাগরিকের কাছে সমাজ যা প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশা পুরণে এই শিক্ষা একান্ত সহায়ক।

৪। **সংস্কৃতি বা কৃষ্টিমূলক শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

৫। **সংগতিবিধানে সহায়ক শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে শেখায়। সমাজের প্রতিটি সদস্য যাতে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তাহলে সমাজ থেকে হিংসা, দ্বন্দ্ব, বিভেদ প্রভৃতি দূর হবে এবং আগামী দিনে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

৬। **সামাজিক বিকাশে সহায়ক শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ সাধনে সহায়ক। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে।

৭। **বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য্য বোধের বিকাশ সাধনে সহায়ক। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি বিকশিত হয়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

৮। **সৌন্দর্য বোধের শিক্ষা :** শান্তি শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সৌন্দর্য বোধের বিকাশ ঘটায়। এই শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা একটি স্বপ্নের সমাজ তথা পৃথিবীর সন্ধান পাবে।

শান্তি শিক্ষার বাধাসমূহ (Barriers of Pease Education) :

শান্তি শিক্ষার অগ্রগতি প্রচার ও প্রসারে যে সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলি নিম্নরূপ—

সাংস্কৃতিক বাধা : বুৎপত্তিগত অর্থে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কারের মাধ্যমে বা মার্জনার দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়সমূহ। এদিক থেকে সংস্কৃতি হল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা আচার-অনুষ্ঠান, বিচারবুদ্ধি, রীতিনীতি প্রভৃতির মার্জিত বা সংস্কৃত রূপ অর্থাৎ উন্নততর প্রকাশ। তাই সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে সু-শিক্ষা, সুনীতি, সুরুচি, সু-আচার প্রভৃতিকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় সংস্কৃতি হল অশিক্ষা, অভদ্রতা, রুক্ষতা প্রভৃতির বিরোধী।

শিক্ষা হল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রতিটি সমাজেই শিক্ষার মাধ্যমেই তার সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন করে এবং সংরক্ষণ করতে চায়। কোনো সমাজই তার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সীমারেখা অতিক্রম করে না। তার নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এই

সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে তাদের ধর্মীয় গণ্ডির সীমারেখা অতিক্রম না করায় সমাজে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত মনোভাব সৃষ্টি হয় যা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

শান্তি শিক্ষার প্রসারে সাংস্কৃতিক বাধা ব্যক্তি সমাজকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে প্রত্যেক সমাজ তার নিজস্বতা রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা দেশ এবং বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরীতে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ মানুষই মানসিকতায় ঐতিহ্যবাদী যা তাদের নতুন কোনো কিছু গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে দেয় না। মানুষ ঐতিহ্যের ব্যাপারে সাধারণত আবেগ অনুভূতি তাড়িত হয়। আগেকার দিনের সাবেকি আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণাকে মানুষ উপরে তুলে ধরে। অনেক সময় মানুষ আগেকার দিনের আকার্যকর বাতিল ও ক্ষতিকর বিষয় আকড়ে রাখতে চায়। ঐতিহ্য ও অতীতের প্রতি এই টান শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি করে।

মনস্তাত্ত্বিক বাধা : শান্তি শিক্ষা প্রসারের একটি অন্যতম বাধা হল মনস্তাত্ত্বিক বাধা যা নতুন উদ্ভাবনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ব্যক্তি মানুষের আচার-ব্যবহার, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়াস-প্রবণতা, প্রেরণা প্রভৃতি শান্তি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থের সঙ্গে সমস্ত কিছু জড়িয়ে ফেলায় অনেক সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রসারের জন্য তৃণমূল স্তর থেকে ব্যক্তির প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রয়োজন মানুষের উন্নত মানসিকতার। এই মানসিকতা গড়ে ওঠে অহংবোধকে কেন্দ্র করে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক আচরণের প্রতীক হল তাদের মনোভাব, মতামত, অনুভব অভিপ্রায় কার্যধারা প্রভৃতি।

আমাদের দেশের অনেক স্থান আছে যেখানে আজও শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পারেনি। যে সমস্ত কারণে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল ব্যক্তির আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অভাব। ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে তার তাদের সন্তান-সন্ততিদের আজও শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহের অভাবে এই শিক্ষার অগ্রগতি তেমন বিস্তার লাভ করতে পারছে না।

রাজনৈতিক বাধা : শান্তি শিক্ষার প্রসারে মূল যে প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হল রাজনীতি। রাজনৈতিক ফায়দার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল শিক্ষা প্রসারে উদ্যেগ, বিভিন্ন ন্যায়নীতি গ্রহণ করলেও সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার তেমনি কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। রাজনৈতিক কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবী জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিকে পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ফল আজও জাপানবাসীকে ভোগ করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগের, জাতিভাগের, ভূ-খণ্ড ভাগের মতো নহবত আমাদের দেখতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক কারণেই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এবং সমাজের এক শ্রেণী মূল শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বেশি হিংসার সৃষ্টি হয় বলে বিভিন্ন মহল মন্তব্য করেছে। যেকোনো ছোটোখাটো ঘটনাকে রাজনৈতিক.....

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই বহু প্রাচীন। প্রাচীন যুগ থেকেই তা বিদ্যমান। যার গ্রাস থেকে আজও বিজ্ঞান মানসিকতার যুগেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না, যা আমাদের সুন্দর সবুজ সমাজকে পদে পদে পর্যদস্ত করছে। একমাত্র সদিচ্ছার অভাবেই শান্তি শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারছে না।

৭.৫ Relevance of pease : National and International Context :

শান্তি শিক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, সমাজ, দেশ এমনকী সাড়া বিশ্বে শান্তির বাণী প্রচার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত। শান্তি শিক্ষার পরিধি আলোচনা প্রসঙ্গ-এ বলা যায় যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই যেহেতু এই শিক্ষার মূল আলোচ্য বিষয় তাই শিক্ষার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে UNO বা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা যেমন UNESCO বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করতে ব্যস্ত। Learning to leave together বা এক সঙ্গে বসবাসের জন্য শিক্ষা এবং Learning to be বা মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা এর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির যে অবদান অর্থাৎ জাতীয় সংহতি বা National Intergration এবং International Understanding বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য যে শিক্ষা তাও এই শান্তি শিক্ষারই অঙ্গ।

মূল্য বোধের শিক্ষা বা Value oriented Education যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বা শিক্ষা সম্পর্কে যে বোধ তৈরী হয় তাও শান্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকতার শিক্ষা যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার মধ্যে নৈতিক জ্ঞান বিকশিত হয়, শিক্ষার্থীর ভালো মন্দ বিচার করতে পারে এবং যথা সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তাও শান্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মকানুন, সময়ের মূল্য, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিকশিত হয় শান্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

Learning to be বা মানুষ হওয়ার জন্য যে শিক্ষা যার মধ্যে দিয়ে ব্যপ্ত সমাজে একজন যোগ্য উত্তরাধিকার পায়, যোগ্য মানুষ পায়, সে সবসময় সমাজের আদর্শ হয়ে থাকবে প্রভৃতি শান্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা, সহমর্মিতা, যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান, শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাপরায়ণতা প্রভৃতি শান্তি শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী অর্জন করে।

শান্তি শিক্ষা এমন এক সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সাহিত্য থেকে বাণিজ্য, বিজ্ঞান থেকে দর্শন সবই শান্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় বলা যায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্ত উপকরণ, আলোচনা, প্রচেষ্টা, মাধ্যম, হাতিয়ার, সবই শান্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

UNESCO :

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য শিক্ষার সম্পর্কে আজ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় সকলেই সহমত পোষণ করেন। শিক্ষার একটি লক্ষ্য হল বিশ্ব শান্তি, বিশ্বভাতৃত্ববোধ, বিশ্বনাগরিকতা, বিশ্বমানবিকতা ইত্যাদির

উন্নয়ন। এই আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টি করতে পারলে শান্তি প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে অগ্রসর হবে। বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করাই হল আন্তর্জাতিকতা বোধের মূল কথা। এই বিষয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে তা হল UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), এই UNESCO সারা পৃথিবীব্যাপি নানা ধরনের আলোচনা চক্র এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাকে কীভাবে শান্তির কাজে লাগানো যায় তা সে বিষয়ে যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য শিক্ষার মূল নীতিগুলিকে উল্লেখ করতে গেলে নিম্নলিখিত দিকগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

১। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা

২। নিরপেক্ষ চিন্তনের বিকাশ

৩। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান আগ্রহ।

৪। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দূরীকরণ।

৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

৬। স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ।

৭। পারস্পরিক ভিতি দূরীকরণ।

৮। যৌথ দায়িত্ব ও আদর্শ মূল্যবোধ জাগরণ।

৯। গণ মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি, নতুন আবিষ্কার ইত্যাদি তথ্য সর্বত্র পরিবেশন করা।

এই সমস্ত মূলনীতির উপর শিক্ষা ব্যবস্থা চালনা করলে শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শান্তি স্থাপনের পথ সুগম হবে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা চলে যে সমগ্র বিশ্বে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যদিও সমস্ত ধরনের অশান্তির কারণ দূর করা শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হয় না তাহলেও বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যেসব কারণগুলি রয়েছে তা শিক্ষার দ্বারা প্রসারিত করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় শান্তির জন্য যে মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিশেষ প্রয়োজন যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিশ্ব প্রেম, দয়া সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এক দিন যে এই বিশ্বমানবতার জন্য তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্তমান সময়ের রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিকতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বিশ্বভারতীতে বিশ্বের সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনিই বলতে পেরেছিলেন— হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন, শক, হুনদল, পাঠান-মোগল এক দেহে হল লিন.....।

তাই শান্তির জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিগুরুকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করা কোনোভাবেই অতিশয়োক্তি নয়।

বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী সংকুচিত হয়েছে। সময় ও দুরত্ব বর্তমানে কোনো প্রশ্নই নয়। পৃথিবীর একটি দেশের উন্নতি অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব ফেলে। এর জন্যই

প্রয়োজন হয় সমস্ত দেশগুলি একত্রে বসে তাদের সমস্যা সমাধান করা। এছাড়াও পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি যুদ্ধ শুরু হয় তার প্রভাব অন্যান্য দেশের উপরেও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন থাকা অবশ্যই প্রয়োজন যা যুদ্ধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে পারে। এছাড়াও বর্তমানে বিশ্বে এটা সম্ভব নয় যে কোনো দেশ প্রাচুর্যে ভরপুর হবে, সম্পদশীল হবে যেখানে অন্যান্য দেশের জন সাধারণ দারিদ্র এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। এই ধরনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা আন্তজার্তিক স্তরেই সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হল বিশ্বব্যাপী সংগঠন। UNO স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এইভাবেই দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বশান্তির জন্য League of Nation নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এর লক্ষ্য পূরণ হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সানফ্রান্সিসকোতে UNO প্রতিষ্ঠিত হয়। UNO-র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাবকমিটি হল SECURITY COUNCIL. এই SECURITY COUNCIL -এর ৫জন আজীবন সদস্য হল আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। এই দেশগুলি ভোট দেওয়ার অধিকারী। ভোটের অর্থ হল SECURITY COUNCIL উক্ত আজীবন সদস্যদের সহমত ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারবে না। এই COUNCIL-এ একাধিক সাময়িক সদস্য আছে। UNO-র অধীনে অনেক অরাজনৈতিক এবং বিশেষ বিষয়ের উপর অনুমোদিত সংস্থাও আছে যেমন— WHO, UNESCO, INTERNATIONAL COURT JUSTICE, THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) ইত্যাদি।

বিভিন্ন সময়ে বিশ্ব শান্তির স্বার্থে UNO বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুয়েজ খালের প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড ও ইজিপ্টের মধ্যে যে যুদ্ধের পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। তার পূর্বে কোরিয়ার যুদ্ধ যা বিশ্বযুদ্ধ রূপ নিতে চলেছিল তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কাশ্মীর সমস্যা তা পরিপূর্ণ সমাধানেও সচেষ্ট হয়েছে। আরব-ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ-এ পরিণত হতে চলেছে তার প্রতিরোধেও এখনও পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সমগ্র বিশ্বের দারিদ্র ও রোগ নিবারণের উল্লেখযোগ্য অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে। এই কাজটির ক্ষেত্রে UNO-র বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যেমন IMF অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে, ILO বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে কাজ করে। একইভাবে UNESCO শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এইভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণ ছাড়াও আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে UNO-র অবদান প্রশংসাযোগ্য।

এতৎসত্ত্বেও অনেকেই UNO-র কাজে সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে, UNO-র উপর আমেরিকার ও ফ্রান্সের প্রাধান্য এবং নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যায়। ২৫ বছরের ব্যাপক চেষ্টার ফলে চিনকে UNO-র সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ভিয়েতনামের সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। পূর্ব বাংলার অসহায় মানুষ-এর হত্যাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমেরিকা বর্বরোচিতভাবে ছোটো দেশের উপর বোমাবর্ষণ করেছে। লে বাননের উপর ইজরাইলের আক্রমণ বাধা দিতে সক্ষম হয়নি এবং হাজার হাজার অস্ত্রহীন প্যালেস্টাইনদের হত্যার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। ভোট দেওয়ার ক্ষমতা অপব্যবহারের জন্য সংকট মুহূর্তে UNO উপযুক্ত ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়নি। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় সেখানে UNO সাফল্য লাভ করতে পারি না।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা থাকলেও বিশ্বশান্তির একমাত্র আশা হল UNO-এর সদস্যরাই UNO-কে বিশ্বের একটি সার্থক সংগঠন রূপে গড়ে তুলতে পারে। সমস্ত দেশগুলিই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এটিকে আদর্শ বিশ্ব সংগঠনে পরিণত করতে পারে। UNO-র গুরুত্ব ক্রমশ বিশ্বের সব দেশ এবং সব জনগণ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। সকলেই মনে UNO-কে আরও শক্তিশালী করা উচিত এবং সকলেরই একে মান্য করা উচিত। সারা বিশ্বই UNO-র সপক্ষে এগিয়ে আসছে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা চলে যে, সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যদিও সমস্ত ধরনের অশান্তির কারণগুলিকে দূর করা শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হয় না। তাহলেও বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যে মৌলিক কতর্ব্যগুলি রয়েছে তা শিক্ষার দ্বারা প্রসারিত করা সম্ভব।

১.৫.১. পঞ্চশীল (Panchaseel) :

বিগত দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ পৃথিবীর ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধবাজ, ক্ষমতালোভী শাসক থেকে প্রতিটা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছে যে, বিশ্বব্যাপী শান্তির পরিবেশ ছাড়া বিশ্বের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। যার ফলে শুরু হয় বিশ্বশান্তির আন্দোলন। স্থাপিত হয় UNO এবং গ্রহণ করা হয় আরও কতকগুলি কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চশীল। যদিও পঞ্চশীলে এশিয়ার শক্তিধর দুটি দেশ ভারত ও চিন অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই নীতি যে সমগ্র বিশ্বে শান্তি রক্ষার্থে দৃঢ় একটি পদক্ষেপ সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

যে পাঁচটি নীতির উপর পঞ্চশীল প্রতিষ্ঠিত তা হল —

১) Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty

(উভয়দেশের সীমারেখা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা)।

২) Mutual Non-aggression

(পারস্পরিক অহিংসার বাতাবরণ)।

৩) Mutual Non-interference in each other internal affairs

(উভয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করা)।

৪) Equality and mutual benefit

(সমতা এবং পরস্পর পরস্পরের উপকারে আসা)।

৫) Peaceful co-existance

(শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান)।

আমাদের দেশের বৈদিক যুগ থেকেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে এই পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ আছে। অশোক এবং বুদ্ধের যুগে এই নীতিগুলির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যেভাবে এর ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে নতুনত্ব দেখা যায়।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও শান্তির পূজারি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই দিল্লীতে এই শান্তির চুক্তিটি স্বাক্ষরিত করেন। অন্যান্য দেশগুলিও এই চুক্তির প্রশংসা করেন।

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অ্যাফ্রো-এশিয়ান দেশগুলি একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে অংগ্রহণকারী নয়টি দেশ কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তী স্তরে ক্রমশ অন্যান্য দেশও উক্ত নীতি গ্রহণ করে। উক্ত নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করতে সক্ষম হয় তা বোঝা যায়।

শক্তিশালী দেশগুলি যখন দুর্বল দেশগুলি সীমারেখা অতিক্রম করে তখনই যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রথম নীতিটি এক্ষেত্রে বাধা দেয়। কারণ প্রতিটি দেশই অপর দেশের সীমারেখা এবং সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করে।

যত সময় পর্যন্ত শক্তিশালী দেশ দুর্বল দেশকে আক্রমণ করবে এই আতঙ্ক বজায় থাকে তত সময় পর্যন্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতার কোনো শেষ নেই। দ্বিতীয় নীতিটি এই আগ্রসী মানসীকতাকে বাধা দেয়। কোনো দেশ চায় না যে অন্য কোন দেশ তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। অন্য দেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলানোর কারণে অনেক অশান্তি ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। তৃতীয় নীতিটি এই প্রতিবাদস্বরূপ।

চতুর্থ নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশ বিভিন্ন মতাদর্শের অধিকারী হলেও উভয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে।

পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতিই যথেষ্ট প্রচারলাভ করে। বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলি মন্তব্য করেন যে তারা পঞ্চশীলের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই মন্তব্যের সারবত্তা খুব কম। তিব্বত এবং চিনের মধ্যে এর কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। সাম্প্রতিককালের ঘটনাসমূহ যেমন বাংলাদেশ, উত্তর ভিয়েতনাম বোমাবর্ষণ, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ, লেবাননে ইজরায়েলি আক্রমণ সবই পঞ্চশীলের বিপরীত কথাই বলে। শুধু মুখের কথাই নয়, দেশগুলিতে এর প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন। পঞ্চশীল সত্যিকারের বিশ্বশান্তি আনয়নে সক্ষম।

৭.৬ শান্তির অগ্রগতিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Teacher's role in promoting peace) :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করে। এই পাঠক্রম ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এক পাঠক্রম। ১৯৭৪ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কার্যকর করা হয়। পরবর্তীকালে এই পাঠক্রমের পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস ঘটানো হলেও মূল কাঠামোটি অপরিবর্তনীয় রয়েছে। এই পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয়গুলোকে ৫টি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ভাষা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, কর্মশিক্ষা এবং অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে

পাঠক্রমটি রচনা করা হয়েছে। এই পাঠক্রম ক্রমে পাঠ্য বিষয়গুলি এমন ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশ হয়।

এই স্তরের উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন মূল্যবোধ তৈরী হয় যার মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে নৈতিকতার ধারণা তৈরী হয় অর্থাৎ নৈতিক বিকাশ সাধন হয়। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার ধারণা তৈরী হয়। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরী হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রমে আলাদা বিষয় হিসাবে শান্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি না হলেও এই স্তরের শিক্ষার মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরীর মানসিকতা গড়ে ওঠে।

মানুষ স্বভাবগত দিক থেকে শান্তিপ্রিয় এবং শিক্ষা এমন এক বিষয় যা মানুষকে সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করায়। শিক্ষা একটি সজ্ঞান প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটে এবং তার মাধ্যমে সমাজেও পরিবর্তন আসে। আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা যার মধ্যে অন্যতম শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশ সাধন এর মধ্যে অন্যতম শিক্ষার্থীর নৈতিক লক্ষ্য একটি বিতর্কিত বিষয়। বর্তমানে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে ভবিষ্যৎ একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত ভাবে শান্তি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে—

১) বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে ছোট ছোট গল্প উপন্যাস যার মধ্যে দিয়ে আত্মত্যাগ, মৈত্রী, ভাতৃত্ব, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করতে হবে। এটি একটি বিশেষ পিরিয়ডের মধ্যে নিবন্ধ থাকবে এমন নয়।

২) উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হবে। এছাড়াও উৎসব অনুষ্ঠান খেলাধূলো, সেবামূলক কাজ-কর্ম প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিকবোধের উন্মেষ ঘটে থাকে যা শান্তি শিক্ষার অন্যতম পথ।

শিশু নীতিপরায়ণ হয়ে জন্মায় না। অন্যান্য প্রাণীর মত তার কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তার এই সব প্রবণতা বা প্রবৃত্তি সব সময় সমাজ অনুমোদিত আদর্শের মধ্যে পরে না। সুতরাং তার বহুবিধ জৈব প্রবৃত্তিকে শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তার আদিম প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে উদগতিসাধন করে তার মধ্যে চারিত্রিক আদর্শের সৃষ্টি করা শিক্ষার একটি অন্যতম দায়িত্ব। শান্তি শিক্ষা ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, দয়ালু, পরহিতকারী ও সংযতেন্দ্রীয় হতে সাহায্য করে। তাই অন্যান্য শিক্ষাবিদদের মতো শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বিশ্বাস করেন জীবনের প্রধান মূল্য হল নৈতিক মূল্য এবং শান্তি শিক্ষাই এই মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুগেও যেখানে সর্বদা হিংসা, বিদ্বেষ, রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, বেকারত্ব প্রভৃতির উস্কানি ব্যক্তি এবং সমাজকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে চলা, যেখানে শান্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার

করা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় UNO বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এর বিভিন্ন sister organiozation যেমন UNICEF, UNESCO, WHO প্রভৃতি সংস্থা শান্তির বাতাবরণ তৈরীতে নিযুক্ত।

বর্তমানে আদর্শহীনতা, দুর্নীতি প্রসার, সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক নৈতিক অবমূল্যায়ন পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও শিক্ষাবিদদের গভীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপান বর্তমানে শান্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ইংল্যাণ্ড ও এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। আমেরিকাও তার দেশের ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতার জন্য শান্তি শিক্ষার সূত্রপাতের কথা ভাবছে।

সামাজিক দায়দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, সততা, নির্লোভ স্বভাব, পারস্পরিক ভালোবাসা, মূল্যবোধ, সৌভাতৃত্ব নিয়ম নিষ্ঠা ইত্যাদির বর্তমানে অভাব দেখা দিয়েছে। উক্ত বিভিন্ন নৈতিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শান্তি শিক্ষা বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশের পাঠক্রমে শান্তি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়, সেগুলি শান্তি শিক্ষারই অঙ্গ। একজন নীতি পরায়ণ ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনৈতিক নেতা সমাজকল্যাণে সহায়ক হতে পারে। নীতি জ্ঞানহীন ব্যক্তি যতই উচ্চ শিক্ষিত হন তিনি সমাজের বিষ ফোড়া স্বরূপ। সমাজে কলকারখানা বিজ্ঞান শিল্পের বহুবিধ উন্নতি হতে পারে কিন্তু চরিত্রবান মানুষের অভাবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন বলেছেন — "We are building a civilization, not a factory or workshop., The quality of civilization depends not on the material equipment but on the character of men." অর্থাৎ কোনো সভ্যতা মানুষের চরিত্রের উপর নির্ভর করে, কতকগুলি ভৌতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে না। তাই চরিত্রবান মানুষ, সুগঠিত শান্তিপূর্ণ সমাজ, বিশ্বে শান্তির বাতাবরণের জন্য বর্তমানে শান্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষক কোনো কিছু কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থী পারস্পরিক সহযোগিতায় ও বসবাসের মাধ্যমে শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ। তিনি শিক্ষার্থীর মনে জীবনাদর্শ জাগিয়ে তুলবেন, তিনিই তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবেন। প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তি শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, তেমন মধ্যযুগেও শান্তি শিক্ষা পাঠ্যক্রমের গতানুগতিক বিষয়ের মতো না থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ছিল যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আচার-আচরণ ইত্যাদির বিকাশ সাধন হত। আধুনিক যুগে এই শিক্ষার গুরুত্ব আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপদে অনুভব করি। শিক্ষক এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী বিকশিত করে সেগুলি হল নিম্নরূপ —

১) নৈতিকতার বিকাশ

২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ

৩) সামাজিকীকরণের বিকাশ

৪) মূল্যবোধ গঠন

৫) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ

শিক্ষা হল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রতিটি সমাজেই শিক্ষক শিক্ষার মাধ্যমে তার সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালন করে এবং সংরক্ষণ করে, কোনো সমাজ-ই তার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সীমারেখা অতিক্রম করে না। তার নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস আকড়ে ধরে রাখতে চায়। এই সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে তাদের ধর্মীয় গণ্ডীর সীমারেখা অতিক্রম না করায় সমাজে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমাজ সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়। শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত মনোভাবের সৃষ্টি করে যা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

শান্তি শিক্ষার প্রসারে সাংস্কৃতিক বাধা ব্যক্তি সমাজকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে প্রত্যেক সমাজ তার নিজস্বতা রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যা দেশ এবং বিশ্বের শান্তির বাতাবরণ তৈরীতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ মানুষ-ই মানসিকতায় ঐতিহ্যবাহী, ব্যক্তিবর্গের ঐতিহ্যবাহী মানসিকতা তাদের নতুন কোনো কিছু গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে দেয় না, শান্তি শিক্ষা প্রসারে অন্য একটি বাধা হল মনস্তাত্ত্বিক বাধা। ব্যক্তি মানুষের আচার-ব্যবহার, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়াস-প্রবণতা, প্রেরণা প্রভৃতি শান্তি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে অপরিহার্য। শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণা জাগিয়ে শান্তি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য তৃণমূল স্তর থেকে ব্যক্তির প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রয়োজন মানুষের উন্নত মানসিকতা। আর এই মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও নানাভাবে আন্তর্জাতিকতা বোধের শিক্ষায় সহায়তা করে। প্রথমতঃ, শিক্ষকের যদি এই আদর্শের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কখনোও ওই মনোভাব জাগাতে পারবেন না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার মানসিক গঠন এবং প্রবণতা এমন হবে, যাতে করে তিনি সুষ্ঠুভাবে এই আদর্শের পথে পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ছাত্রদের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারেন। এক কথায়, শিক্ষককে বিশ্বমনোভাবাপন্ন হতে হবে, তবেই তিনি আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত করে শান্তি শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

শিক্ষা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ী শক্তি। বর্তমান যুগে যখন মানুষ পরস্পরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ, একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে না, তখন সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে একমাত্র শিক্ষাই পারে। আর এই সমাজব্যবস্থাকে শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসকে যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে যুগে যুগে হিংসা এবং আগ্রাসী মনোভাবের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এই ধরনের আগ্রাসী এবং হিংসাত্মক মনোভাবকে দূর করাই হল শান্তি স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য। তবে Karl Marx সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন

ধরনের শ্রেণী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। এই ধরনের সংগ্রামের মাধ্যমেই যে সমাজে সাম্যতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি আসা সম্ভব এ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে Zeittin (1973) মার্কসের এই মতবাদকে সমর্থন করেন। কাজেই বলা যেতে পারে যে শান্তি রক্ষার জন্য একদিকে যেমন প্রত্যেকের সমান অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি কিছু কিছু সামাজিক দ্বন্দ্বের এবং যুদ্ধেরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলি বিভিন্ন কৌশলে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির উপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে UNO বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

শান্তি ক্ষেত্রে Erich Fromm-এর (1973) মতবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে প্রতিটি গোষ্ঠীর অপর গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার একটি প্রবৃত্তি রয়েছে। একে তিনি Instinctivism নাম দিয়েছেন। Frued ও মানুষের মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হল এই ধরনের মানব প্রবৃত্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। এই প্রবৃত্তিগত দিকটি যাতে করে শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে তা বিশেষভাবে দেখা দরকার। Russell (1961)-এর মতে প্রথমেই কী কী কারণে দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নির্ধারণ করা দরকার এবং শিক্ষার দ্বারা সেইগুলিকে যথাযথভাবে দূর করা প্রয়োজন।

৭.৭ সারসংক্ষেপ (Summing Up) :

শান্তি শিক্ষা হল সামগ্রিক শিক্ষা। যা ব্যক্তির দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। ভালবাসা, সহানুভূতি, সত্যতা, স্বচ্ছতা, সহযোগিতা, জনসেবা, নৈতিকতা সুন্দর সমাজ ও সবুজ পৃথিবীর প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ভালোবাসা এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর শান্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি মানুষের আন্তরিকতার প্রয়োজন। শান্তি বলতে বোঝায় আত্মাশান্তি, সমাজের শান্তি এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তি যেটি ব্যক্তি মানুষের আন্তরিক উদ্যোগের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।

অন্যদিকে শিক্ষা হল সামাজিক সংবিধানের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্থক অভিযোজনে সক্ষম হয়। মানুষ সামাজিক জীব এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং এই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্যই ব্যক্তি মানুষ শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করে। শান্তি শিক্ষা হল দক্ষতার শিক্ষণ। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দক্ষতাসম্পন্ন সমাজ গড়ার কারিগর তৈরী করা - যারা সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করবে। শান্তি যেমন শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেয় তেমনি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। শান্তি শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এবং একজন নাগরিকের কাছে সমাজ যা প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশা পূরণে এই শিক্ষা একান্ত সহায়ক। কোন সভ্যতা মানুষের চরিত্রের উপর নির্ভর করে, কতকগুলি ভৌতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে না। তাই চরিত্রবান মানুষ সুগঠিত শান্তিপূর্ণ সমাজ, বিশ্বে শান্তির বাতাবরণের জন্য বর্তমানে শান্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার জন্য শিক্ষার সম্পর্কে আজ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় সকলেই সহমত পোষণ করেন। শিক্ষার একটি লক্ষ্য হল বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবিকতা ইত্যাদির উন্নয়ন। এই আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি করতে পারলে শান্তি প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে অগ্রসর হবে। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য আন্তর্জাতিকতা বোধই হল মূল কথা।

৭.৮ প্রশ্নাবলী (Questions) :

অতি সংক্ষিপ্ত :

১) শান্তি শিক্ষা বলতে কী বোঝেন?

২) শান্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

৩) আন্তর্জাতিকতাবোধ কী?

৪) শান্তি শিক্ষার মধ্য দিয়ে কোন কোন গুণাবলী প্রকাশিত হয়।

৫) কোন কোন সংস্থা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করতে ব্যস্ত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) শান্তি শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কী?

২) বর্তমানে শান্তি শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩) শান্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন।

৪) বিদ্যালয়ে কীভাবে শান্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা বিশ্লেষণ করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১) শান্তির অগ্রগতির শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২) শান্তি শিক্ষায় UNESCO-র ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩) শান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে UNO-র কার্যকারিতা পর্যালোচনা করুন।

৪) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে শান্তি শিক্ষার ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৭.৯ References :

সাম্প্রতিককালীন ভারতীয় শিক্ষার ধারা — ডঃ দেবাশীষ পাল

— ডঃ দিলীপ কুমার ঠাকুর

— হামিদুল হক

একক - ৮

শিক্ষায় বর্তমান সমস্যা ও উন্নতি
(Present Problem and Prospect)

গঠন ❑ (Structure)

৮.১ সূচনা

৮.২ উদ্দেশ্য

৮.৩ সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা ও তার সমস্যা

৮.৪ সর্বশিক্ষা অভিযানের সমস্যা

৮.৫ মাধ্যমিক শিক্ষায় সমস্যা ও অগ্রগতি

৮.৬ উচ্চশিক্ষার সমস্যা

৮.৭ বর্তমান নারীশিক্ষায় সমস্যা ও অগ্রগতি

৮.৮ শিক্ষক ও শিক্ষণ

৮.৮.১ শিক্ষক শিক্ষনের মানোন্নয়নের উপায়

৮.৯ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

৮.৯.১ অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য

৮.৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সমস্যা

৮.৯.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অগ্রগতি

৮.১০ বৃত্তি শিক্ষা

৮.১০.১ বৃত্তি শিক্ষার সমস্যা

৮.১০.২ বৃত্তি শিক্ষার অগ্রগতি

৮.১১ সারসংক্ষেপ

৮.১২ প্রশ্নাবলী

৮.১৩ উৎস (References)

শিক্ষায় বর্তমান সমস্যা ও উন্নতি

(PRESENT PROBLEM AND PROSPECT)

৮.১ ❑ সূচনা (Introduction) ঃ

শিক্ষা মানবসমাজের উন্নতির প্রধান হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সারা পৃথিবীর মোট নিরক্ষর জনসংখ্যার অর্ধেক ভারতে বাস করে। সেই কারণে আমাদের দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে এই নিরক্ষর মানুষদের যুক্ত করা যায় না। আগামী দিনে দেশের উন্নতির জন্য ব্যাপক অংশের শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও ভারতে নারীশিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন সামাজিক কারণ যেমন — অল্প বয়সে বিবাহ ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার নারীশিক্ষার প্রসারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষা হল ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গঠন করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। শিশুর ভবিষ্যৎ বৃত্তি কি হবে, সে কিভাবে জীবিকা অর্জনে সমর্থ হবে তা প্রথমেই নির্ধারণ করা আবশ্যক। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সার্থক রূপায়নের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয় যাতে তাঁরা সবার চাহিদা বুঝতে পারেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলির সমাধান হলে দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে।

৮.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে সমর্থ হবে —

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কি - তা জানবে।

(গ) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কি এবং এর গুরুত্ব কতখানি তা বুঝবে।

(ঘ) নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সমস্যা সম্পর্কে জানবে।

(ঙ) সর্বজনীন শিক্ষা কেন? সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার সমস্যা ও তার উন্নতি কতটুকু তা জানবে।

1. Elementary Education (Special reference with SSA) ঃ

উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধ্যয়ন যেমন আধুনিকতা অর্জনে সাহায্য করে তেমনি প্রারম্ভিক শিক্ষা দরিদ্র, সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল আস্বাদন করতে সাহায্য করে এবং আধুনিকতাকে আরও অর্থবহ করে তোলে। এই জন্যই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ তার সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানের এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

একজন শিক্ষিত নাগরিক জাতির সম্পদ। একজন নিরক্ষর মানুষ কখনোই রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভারতবর্ষে এখনও মুষ্টিমেয় কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে উন্নত শ্রেণির মানুষই শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি। মানুষ লিখতে ও পড়তে পারলে তার প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও কর্মদক্ষতার সমৃদ্ধি ঘটে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা ছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি।

সকলের জন্য শিক্ষার আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে ভারতবর্ষও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতবর্ষে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' নামে এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

সর্বশিক্ষা অভিযানের বিশেষ তাৎপর্য হল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার কার্যকারিতার উন্নতিসাধন করা এবং এক একটি জনগোষ্ঠীর পরিচালনায় সমাজসেবা মূলক মনোভাব নিয়ে নির্দিষ্ট বয়সে শিশুদের উপযুক্ত মানের আবশ্যিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সর্বশিক্ষা অভিযান মানুষের, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত শিশুদের এবং প্রতিবন্ধী ও সহায়সম্বলহীন শিশুদের শিক্ষার চাহিদা পুরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

৮.৩ ❑ সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার সমস্যা ঃ

(i) অর্থের অভাব ঃ প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তনের একটি বড়ো বাধা হল সরকারি অর্থাভাব। শিক্ষার জন্য অর্থাভাবের অভাবের অজুহাত ব্রিটিশ যুগ থেকে আজও পর্যন্ত চলে আসছে। আমাদের দেশে কোঠারী কমিশন (1964-69) জাতীয় আয়ের 6 শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু আজও এই ব্যয়ের পরিমান মাত্র 3 শতাংশ।

(ii) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঃ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রারম্ভিক শিক্ষার পথে একটি মস্ত বড় বাধা। প্রতি দশ বছর অন্তর যে আদমশুমারি হয় তাতে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iii) মেয়েদের শিক্ষার বাধা ঃ অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, সংসারের কাজে ছোটবেলা থেকেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যাওয়া, বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার, অভিভাবকদের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে মেয়েদের নূন্যতম শিক্ষা গ্রহণের সুযোগটুকুও পাওয়া সম্ভব নয়।

(iv) সাধারণভাবে মানুষের দারিদ্র ও উদাসীনতা ঃ অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও উদাসীনতা সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে একটি বড় বাধা। অন্নবস্ত্রের অভাব মেটাতে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার চেয়ে শিশুশ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে বেশি উৎসাহী নন। শিল্প এবং কৃষি ব্যবস্থায় যতদিন শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার ব্যবস্থা না হবে ততদিন শিক্ষায় সর্বজনীনতা লাভ করা সম্ভব নয়।

(v) সরকারী উদাসীনতা ঃ রাজ্যস্তরে বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষা আইন পাশ হলেও এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেননি। প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার থেকে গৃহীত হয়নি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যেটুকু উন্নতি ঘটেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

(vi) বিদ্যালয়ের দূরত্ব ঃ প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 1950-1951 সালের 2.1 লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1999-2000 সালে 8.40 লাখ হলেও সকল শিশুর সুবিধা মতো নিকটবর্তী স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

(vii) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুযোগের অভাব ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাব সর্বজনীন শিক্ষার পথে অন্যতম বাধা হয়ে ওঠে বলে সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় বলা হয়েছে। উপযুক্ত স্কুল-বাড়ি, শ্রেণীকক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ন্যূনতম সুযোগ না থাকলে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়।

(viii) অভিভাবকদের নিরক্ষরতা ঃ ব্যাপক সংখ্যক পিতা-মাতার নিরক্ষরতা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রসারে বড় বাধা। নিরক্ষর পিতা-মাতা শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে সচেতন নন, তাই সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে তাঁদের অনীহা দেখা যায়। অধিকাংশ নিরক্ষর মা-বাবার তীব্র অনাগ্রহ দেখা যায় তাঁদের কন্যাসন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে।

(ix) অন্যান্য কারণ ঃ কতকগুলি আর্থসামাজিক কারণও সর্বজনীন শিক্ষার অগ্রগতিতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। ব্যাপক দারিদ্র্য এবং কর্মহীনতার ফলে বিদ্যালয়মুখী কম বয়সের শিশুরা অর্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় 40 মিলিয়ন শিশুশ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায়, খনিতে, গৃহ নির্মাণ শিল্পে এবং কৃষি কাজে নিযুক্ত। যাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়মুখী বয়সের শিশু। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার পথে অন্তরায়। উদাহরণস্বরূপ আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ হল তাদের নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জনে অসুবিধা, তাদের পরিবেশ উপযোগী পাঠক্রমের অভাব, আদিবাসী শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি।

৮.৪ ❑ সর্বশিক্ষা অভিযানের সমস্যা ঃ

(i) সমাজের অতি দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ যারা 'দিন আনি দিন খাই' - তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় পাঠাচ্ছে না।

(ii) সর্বশিক্ষার জন্য জন সচেতনতা এখনও তৈরি করা হয়নি।

(iii) দেশে অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামাঞ্চলে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

(iv) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ পুষ্টিহীন। মেয়েরা অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত। তাই অভুক্ত পরিবারে পুষ্টিহীন শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় আগ্রহবোধ করে না।

(v) বর্তমানে প্রধান সমস্যা হয়ে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের সংকট। তাই সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প ব্যাহত হচ্ছে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

(vi) সর্বশিক্ষা অভিযানে আর একটি বাধা হল শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই।

(vii) সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত নানা শ্রেণির লোকজন আত্মসাৎ করছে। ফলে সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

'সকলের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা'-র জন্য সর্বস্তরের মানুষ তথা রাষ্ট্রের একটা নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে। তাই সকলের শুভ ইচ্ছা ও উদ্যোগ এবং সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই মহাযজ্ঞের রূপায়ন সম্ভব নয়। আশা করা যায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হবে।

দেশের সর্বশিক্ষা মিশনকে রূপায়িত করার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়গুলির সম্পদকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন কারণেই স্কুল-ছুট শিক্ষার্থীদের বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে একেবারেই শিক্ষার মূলস্রোতে নিয়ে আসা ঠিক নয়। বিধিসম্মত বিদ্যালয়গুলিতে তাদের নিজেদের নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিধিযুক্ত স্কুলগুলিতেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন হলে তবেই তাকে শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসা যাবে। এইসব শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা গেলে তা সব থেকে ভাল ব্যবস্থা হবে। তা না হলে বিধিসম্মত সাধারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এই কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে হয় বিষয়টি কার্যকরী করার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশ প্রয়োজন, না হয় শিক্ষকদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ সম্মান-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তবেই সর্বশিক্ষা অভিযান সার্থক রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলবে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রথম যৌথ রিভিউ মিশন-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে,

(i) বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া শহরের পিছিয়ে থাকা ও অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে শিশু শিক্ষা প্রকল্প।

(ii) সামাজিক, লিঙ্গ ও অক্ষমতা বৈষম্য কমিয়ে আনা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে মেয়েদেরও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত শ্রেণিদের শিক্ষায় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অক্ষমতা অতিক্রম করার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৮.৫ ❑ মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও অগ্রগতি (Present Problems and Prospect) ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষা-দীক্ষায় বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। উডের ডেসপ্যাচের পর এদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রসার ঘটে এবং শিক্ষার আরও অগ্রগতি ঘটে। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালে শাসন সংস্কারের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে নানা ধরনের - পঞ্চম ও ষষ্ঠ, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জুনিয়ার হাই, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির হাইস্কুল, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল। এছাড়া মাদ্রাসা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্কুল বলে ধরা হয়। তবে টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এখনও মাধ্যমিক স্কুল বলে সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়।

মাধ্যমিক স্কুল নানা শ্রেণির রয়েছে। সরকারি ও সরকারি স্পনসর্ড স্কুল এবং ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দু-একটি স্কুল আছে। কিন্তু কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি মাধ্যমিক ক্ষেত্রে তেমন কিছু করে না। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই বেসরকারি। এক্ষেত্রে রয়েছে ইংরেজি মাধ্যম এবং বাংলা মাধ্যম এবং হিন্দি মাধ্যম স্কুল। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও বেশি চোখে পড়ে।

মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভালো। এখানে স্নাতক-নিম্ন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। শিক্ষকদের বেশির ভাগ স্নাতক তাছাড়া এক-পঞ্চমাংশ অনার্স স্নাতক এবং অবশিষ্টাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

দশ বছর অবলুপ্তির পর শিক্ষা পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু স্কুল অনুমোদন, মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন, পাঠক্রম তৈরী, পাঠ্যবই অনুমোদন এবং সার্টিফিকেট দেওয়াই এখন বোর্ডের মুখ্য কাজ। আর্থিক দিক থেকে সরকারি দপ্তরকেই এখনও সর্বময় কর্তা বলা চলে।

পশ্চিমবাংলায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েরা বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পায়। তবুও পশ্চিমবাংলায় জুনিয়ার হাই স্তর পর্যন্ত মেয়েরা বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পায়।

তবুও পশ্চিমবাংলায় জুনিয়ার হাই স্তর পর্যন্ত ৩১.৩% ছেলে এবং ১১.৫% মেয়ে পড়বার সুযোগ পায়। হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্তর পর্যন্ত ১৫.১% ছেলে এবং ৪.৩% মেয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকের শিক্ষামূলক যোগ্যতা যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করেছে। কমপক্ষে সাম্মানিক স্নাতক (Hons Graduate) না হলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেউ শিক্ষক হতে পারেন না। তদুপতি তাঁর শিক্ষণ পদবি (B.Ed) থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি না থাকে তবে শিক্ষকতাকালীন তাঁকে তা অর্জন করতে হবে, না হলে বেতনক্রমে তাঁর কোন তারতম্য থাকে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট শিক্ষক সংখ্যার অর্ধেক স্নাতক, এক পঞ্চমাংশ সাম্মানিক স্নাতক, ১০ ভাগের ৩ ভাগ স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত (M.A, Msc.)। শিক্ষকদের শিক্ষামূলক যোগ্যতা আশাব্যঞ্জক।

মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র (B.Ed) ছাড়াই শিক্ষক হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান (Problema of Secondary Education in W.B. and their remedies) ঃ

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্যা সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা থেকে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু তবুও পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু আঞ্চলিক সমস্যা রয়েছে যেগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত ঃ পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অগ্রগতি হলেও আজও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ফলে ছাত্রসংখ্যা মাধ্যমিক স্তরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক একটা বিদ্যালয় এক একটা শ্রেণির ক, খ, গ তিনটি বিভাগ করা সত্ত্বেও এক একটা বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ৬০-এর উপর।

দ্বিতীয়ত ঃ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য বিষয়ের গুরুভার এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে, অন্যদিকে শিক্ষার সাজসরঞ্জাম, পাঠাগার, পরীক্ষাগার প্রভৃতির শোচনীয় অবস্থা শিক্ষনের অন্তরায়। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভাষা শেখানো প্রয়োজন। কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ে শেখানো হয় না।

তৃতীয়ত ঃ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পরিচালক সমিতি, সরকার এই তিন চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অধিক সময় অতিবাহিত করে। শিক্ষার চাইতে রুটিন তৈরি, সরকারি সাহায্য গ্রহণ ও নিয়ম প্রতিপালন প্রভৃতি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে মৌলিক শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে।

চতুর্থত ঃ সরকারি, বেসরকারি এবং মিশন ও মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে নানা তারতম্য বিদ্যমান। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কেবলমাত্র যোগ্য ছাত্র গ্রহণ করা হয়। মিশন ও মিশনারি স্কুলগুলিতে সংগতিপন্ন লোকের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যেগুলি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বা অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে তারা ছাত্রদের কাছ থেকে প্রচুর মাইনে নিয়ে শিক্ষার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। আর বাকিগুলি অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষাবিপনি চালায়।

পঞ্চমত ঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটা বড়ো অংশ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কেউ বিধানসভার সদস্য, কেউ বা পৌরসভার বিভিন্ন কাজে জড়িত, কেউ বা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে জড়িত। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে রাজনৈতিক বিষ ঢুকে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করছে। শিক্ষার মানকে এমনই এক পর্যায়ে নামিয়ে আনছে যা ভাবতেও লজ্জা আসে। আবার শিক্ষক সংগঠনগুলি শিক্ষকদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার জন্য যত লড়াই করেন তার অতি সামান্য অংশও শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োগ করেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বাহ্যিক সংখ্যাগত উন্নয়ন হলেও মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজন মাফিক সুনাগরিক সৃষ্টি করতে পারছে না।

ষষ্ঠত ঃ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু এর সংখ্যা খুবই নগন্য। অনেক অঞ্চলেই শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পায় না। শিক্ষার্থী বাধ্য হয় কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সাধারণ কোর্সে পড়াশোনা করতে। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট ভালো। তবে এখানে শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার মান কমছে। তাই শিক্ষার মানের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গণতান্ত্রিক নাগরিকতার উপযোগী মানসিকতার বিকাশ ঘটানো মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকতার উপযোগী মানসিকতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে হবে।

৮.৬ ❑ উচ্চশিক্ষার সমস্যা (Problems of Higher Education) ঃ

উচ্চশিক্ষার সমস্যাগুলি হল —

- **প্রথমত ঃ** ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

- **দ্বিতীয়ত ঃ** যেসব ছাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা কিংবা আগ্রহ থাকে না। মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা অথবা কর্মসংস্থান প্রভৃতি সুযোগ না পাওয়ার জন্যই অধিকাংশ ছাত্র উপায়ান্তর না দেখে কলেজের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়। এইভাবে কলেজগুলিতে ছাত্রদের ভিড় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

● **তৃতীয়ত ঃ** উচ্চশিক্ষার স্তরে প্রতিবছরে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করছে এবং তার ফলে মানবশক্তির যে বিরাট অপচয় ঘটছে তা রোধ করার কোনো ব্যবস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এইসব ছাত্রদের জন্য যে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাকে আর্থিক সম্পদের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

● **চতুর্থত ঃ** প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে না। পাঠাগারগুলিতে নতুন পুস্তক সংগ্রহ এবং পরীক্ষারগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া নতুন নতুন গবেষণার জন্য অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার মান ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে।

● **পঞ্চমত ঃ** বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদানের জন্য সুযোগ্য অধ্যাপক সংগ্রহ করা বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে কলেজ কতৃপক্ষ প্রয়োজনে নামমাত্র দক্ষিণা দিয়ে তাদের ব্যবহার করেও প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ওইসব বেকারদের সরিয়ে দেওয়া হয় নানা অজুহাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্রেরা বর্তমানে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণের পরিবর্তে অন্যান্য বৃত্তির প্রতি অধিক পরিমানে আকৃষ্ট হচ্ছেন। আর অধ্যাপনার কাজে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এসে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করছেন। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটছে না, অপরদিকে তেমনিই অধ্যাপকেরা ছাত্রদের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না।

● **ষষ্ঠত ঃ** পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণান কমিশন যেসব সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি কার্যকর করার পুরো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন কোর্সের শেষে একটিমাত্র পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার ফলে এবং পরীক্ষা গ্রহণের নানারূপ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য প্রচলিত পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

● **সপ্তমত ঃ** রাধাকৃষ্ণন কমিশন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর পরিবর্তে ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কোঠারী কমিশন ও কলেজস্তরে মাতৃভাষার দাবী অগ্রগণ্য বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত কমিশনের পরামর্শ আজও সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়নি। তাছাড়া বাংলা ভাষায় ভাল Text Book-এর অভাব ও বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

● **অষ্টমত ঃ** কৃষিবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য যেসব নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকটিতে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাধারণধর্মী শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

● **নবমত ঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির সংখ্যা ও সেগুলির ছাত্রসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন, প্রশাসন ও পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে কলেজগুলির উপর উচ্চশিক্ষাদানের যে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় অর্পন করেছে তা সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না।

● **দশমত ঃ** উচ্চশিক্ষা লাভের দ্বারা কর্মসংস্থান হয় না - এই ধারণা ক্রমশঃ শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হচ্ছে। এই হতাশা নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পড়াশোনার জন্য যেটুকু উদ্যম দরকার তা তাদের থাকে না। কোনরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্তমানে ব্যক্তি চরিত্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করার বদলে কেবলমাত্র ডিগ্রী দানের কারখানায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয়নি। বরং প্রতিদিন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকারকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা যেতে পারে।

(১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পাঠাগার এবং সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা যেমন দুর্নীতি তেমনি শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করাও অনুচিত। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমঝোতা থাকা দরকার। উচ্চশিক্ষালয়ে রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

(৩) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য আরও অধিক পরিমানে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

(৪) কলেজগুলিতে পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৫) পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে।

(৬) উচ্চশিক্ষায় সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে জাতপাত বিচার্য হবে না, তেমনি রাজনৈতিক কোন কারণও বিবেচ্য হবে না।

(৭) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধিক পরিমানে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে ভিড় কমাতে গেলে উপযোগী ছাত্রদের বৃত্তিশিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হল, জনসম্পদের বিকাশ, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় সংহতি রক্ষা, আধুনিকীকরণ, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে, যুক্তি ছাড়া অন্যসব অনুশাসন থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উচ্চশিক্ষার চিত্রটি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে আসছে।

অবশ্য অধ্যাপক, ছাত্র এবং সরকারের সদিচ্ছা এবং উদ্যমও প্রচেষ্টা থাকলে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অবস্থার উন্নতি বেশী সময় লাগবে না।

সমাজের সর্বস্তরে - কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কলা, কারিগরীবিদ্যা প্রভৃতি বৃত্তিতে উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। নতুন জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান। জ্ঞান বিতরণ ও অবিরত নতুন সত্যের

সন্ধান আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি অন্যতম প্রধান কাজ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয় হল গণতন্ত্র, জাতীয়তা, মানবতা, সহিষ্ণুতা, মুক্তি, নতুন চিন্তা এবং সত্যের উৎস। বিশ্ববিদ্যালয় হল গণতন্ত্র, জাতীয়তা, মানবতা, সহিষ্ণুতা, মুক্তি, নতুন চিন্তা এবং সত্যের উৎস। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। উপরোক্ত বিষয়গুলির কথা যদি আমরা মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

৮.৭ ❑ বর্তমান নারীশিক্ষায় সমস্যা (Present Problems of Women Education) ঃ

ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতিই নয়, সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা আইন প্রণয়ন এবং আদেশ জারির মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ক্ষমতায়ন করতে নারীর সমস্যার ওপর গুরুত্ব দান করছে। এর ফলে যদিও শহরাঞ্চলে নারীর অবস্থানের এবং শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও মেয়েদের অবস্থা যথেষ্টই করুন। অনেকক্ষেত্রেই মেয়েদের এখনও প্রথাগত শিক্ষাদান করাকে বিলাসিতা ভাবা হয়। সংসারে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি আচরণের বৈষম্যের কারণে মেয়েদের বোঝা ভাবা হয় এবং তাকে পরমুখাপেক্ষী, আর্থিক এবং শিক্ষাগতভাবে পরনির্ভর করে রাখা হয়। নারীভ্রুণ হত্যা, কন্যাসন্তান হত্যা এখনও অবাধে ঘটতে দেখা যায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে, নারী বহু পরিবারে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে অবাঞ্ছিত। তার অন্যতম কারণ হল অবশ্যই অশিক্ষা। নারীর শিক্ষা গ্রহণে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা হল ঃ

(i) সামাজিক সমস্যা ঃ

সমাজে নারীর অবস্থান খুবই নীচে। কন্যা সন্তান এখনও অবাঞ্ছিত। সামাজিক রক্ষণশীলতা বিশেষ করে মুসলমান, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে নারীশিক্ষা প্রসারে বাধার সৃষ্টি করে। দরিদ্র অংশের জনসাধারণ মনে করে, মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিবাহ হলে মেয়েরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে এবং মা-বাবারও কিছুটা আর্থিক সুরাহা হবে। মুসলিম এবং উপজাতি পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের রেওয়াজ বেশি চোখে পড়ে। অল্পবয়সে মাতৃত্বলাভ সন্তান পালনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলে পাঠিয়ে স্বাক্ষর করা মানে বৃথা সময় এবং অর্থের অপচয় করা। পিতামাতার অজ্ঞতা ও অনীহা শিশুদের শিক্ষায় প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি। এখনও ভারতীয় সমাজে মনে করা হয় যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া মা-বাবার প্রধান কর্তব্য। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে ঘরকন্যা করা এবং সন্তান লালনপালন করাই হল মেয়েদের সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এর ফলে বহু মেয়ে স্কুল বা কলেজে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করতে সক্ষম হয় না। তাই অপচয় এবং অনুন্নয়ন হল নারীশিক্ষার এক প্রধান সমস্যা।

(ii) অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

দারিদ্র শিক্ষার প্রধান সমস্যা। দরিদ্র পরিবারে বহু সন্তান থাকলে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অভিভাবকরা মনে করেন যে মেয়েকে শিক্ষা দিতে পাঠানোটা অপব্যয়। তার থেকে তাকে গৃহের কাজে লাগিয়ে বা অন্যের গৃহে সহায়কারিণীর কাজ করতে পাঠিয়ে উপার্জন করাটা সবচেয়ে ভালো।

যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে তবুও শিক্ষার আনুসঙ্গিক অসুবিধা যেমন বিদ্যালয় কাছে না হলে যাতায়াত করার খরচ, খাতা পেনসিলের খরচ ইত্যাদি বহন করাও আমাদের দেশের অনেক বাবা-মায়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য। ছেলেদের কষ্ট করে পড়ালেও মেয়েদের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যায়।

মেয়েরা দারিদ্র্যের কারণেই খুব পিছিয়ে আছে শিক্ষাক্ষেত্রে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা কম। শিক্ষার জন্য কেবল সহায়তা তারা গ্রহণ করতেও পারে না। শিক্ষার জন্য যেসব সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে দরিদ্র মানুষের কোন ধারণা না থাকায় তারা স্বেচ্ছায় ওইসব সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না।

(iii) ধর্মীয় সমস্যা ঃ

কোন ধর্মই কিন্তু নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রায়শই স্বার্থান্বেষী মানুষের সুবিধার জন্য মেয়েদের উপর নানা অযৌক্তিক বিধিনিষেধে পরিণত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেছে।

(iv) মানসিক সমস্যা ঃ

পুরুষ শাসিত সমাজে রক্ষণশীল পুরুষ মনে করে মেয়েদের লেখাপড়া হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। তাছাড়া বেশি লেখাপড়া করলে বিয়ে দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আবার এই মনোভাবও আছে যে, পুরুষের বুদ্ধি মেয়েদের চেয়ে বেশি।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের দায় শুধুমাত্র মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকায় মেয়েরাও বিশ্বাস করে এগুলি তাঁদেরই একান্ত নিজস্ব। সমাজে মেয়েদের প্রতি অবহেলার মনোভাব লক্ষণীয়। বর্তমান সমাজের শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই নয় — সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক ইত্যাদি যতরকম নিগ্রহ মেয়েদের সহ্য করতে হয় তা মূলে আছে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা এই অবহেলা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব।

আমাদের সমাজে এখনও পণপ্রথার দরুন মেয়ের বিবাহে বিপুল পরিমানে যৌতুক দিতে হয়, কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করা হয়, কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ কন্যা মানে একটি বোঝা, যাকে নিজের দায়িত্ব থেকে অন্যের দায়িত্বে হস্তান্তরিত করতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এখনও কন্যার মা-বাবারা শিক্ষার পেছনে অর্থ অপচয় না করে সেটিকে বিবাহের জোগান হিসাবে রেখে দেওয়াটা পছন্দ করেন।

মোটকথা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, রক্ষণশীল মনোভাব, মেয়েদের নিরক্ষরতা, সরকার ও জনসাধারণের উদ্যোগের অভাব মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের পথে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিতে পারলে মেয়েরাও শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

(i) গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব আছে তা দূর করা দরকার বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদের বিশেষ সচেতন করে তুলতে হবে।

(ii) মেয়েদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যেসব মেয়েরা দিনের বেলায় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন তাদের জন্য রাত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঘটবে।

(iii) গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক স্কুল খুলতে হবে। তাদের বাড়ী থেকে স্কুলে আসা যাতে সহজবোধ্য হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন থাকলে ভাল হয়।

(iv) সরকার এবং জনসাধারণকে নারীশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঃ

২০০১ সালের জনগণনায় মহিলা সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪.১৬ শতাংশ, যা ১৯৮১ সালে ছিল ২৯.৭৬ শতাংশ। ২০০৪-২০০৫ এ মহিলা সাক্ষরতার হার ৫৭%।

মহিলা শিক্ষার বিষয়টিকে প্রথমে কল্যানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছিল (প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১-৫৬)। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) প্রথম বিভিন্ন বিকাশমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়টিকে যুক্ত করে। এর ফলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী চালু করা হয় এবং নারীশিক্ষা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতামূলক কাজে সেমি স্কিল্ড কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নারীশিক্ষায় বিশেষ কর্মসূচী স্বর্ণজয়ন্তি গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ, সাপোর্ট ফর ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ইত্যাদি। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হল - ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর এডুকেশন অফ গার্লস অ্যাট এলিমেন্টারি লেভেল (NPEGEL)।

২০০৩-এর জুলাই মাসে সর্বশিক্ষা অভিযানের অংশ হিসাবে এই NPEGEL গঠিত হয়। EBB বা এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ব্লক বা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যেখানে তপশিলি জাতি বা উপজাতির সংখ্যা বেশি এবং সাক্ষরতার হার ৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ, সেইসব জায়গায় বিশেষ সাহায্য করা হচ্ছে। তপশিলিজাতি, উপজাতির স্বার্থে আরও একটি পরিকল্পনা হল কস্তুরবা গান্ধি বালিকা বিদ্যালয় স্কিম যার সাহায্যে অনুন্নত শ্রেণির মেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবকেরা শিক্ষা সম্পর্কে এখন যথেষ্ট সচেতন। দরিদ্র এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পিতামাতা ও আজ তাঁর মেয়েকে শিক্ষিত করতে চান। শহরের অভিভাবককেরা তাঁদের অল্প বয়স্ক মেয়েদের কমপক্ষে 'গ্রাজুয়েট' না করে বিবাহ দিতে চান না। তাঁরা বর্তমানে বাল্যবিবাহের বিরোধী।

একসময়ে নারীশিক্ষায় পশ্চিমবাংলা ভারতে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল। সেই গৌরবের স্থান আবার ফিরে পেতে হলে সরকারকে আরও বেশী করে উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে নারীশিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রূপায়ন করেছে। এই প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণই নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করবে।

৮.৮ ❑ শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education Present Problems and Prosepect) ঃ

প্রত্যেক শিক্ষকই একজন শিল্পী। তাঁর এই শিল্পে বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার। সার্থকভাবে শিক্ষকতা করতে হলে শিক্ষককে বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর মনস্তত্ব, তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি,

আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের পদ্ধতি ইত্যাদি জানতে হবে। এইসব বিষয়গুলি জানার জন্যই বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষনের প্রয়োজন।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তির উপযুক্ত শিক্ষন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সামান্য অর্থ হবে, তার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ শিক্ষার ব্যাপারে উপকৃত হবেন। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষণের জন্য ব্যয় অপচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকশিক্ষণ সংস্থা শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা নিতে পারে।

কোন জাতি যদি উন্নত মানের শিক্ষা চায় তবে তাকে উন্নত মানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। একটি জাতির উৎকর্ষতা নির্ভর করে তার স্কুলের গুণগত মানের উপর। আবার স্কুলের উৎকর্ষতা নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের চাহিদা প্রচলিত কৃষিভিত্তিক চাহিদার থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং আধুনিক সমাজে শিক্ষকের ভূমিকাও পৃথক হবে। তাঁর সামনে যে সমাজ রয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবেন। যাতে তারা সমাজের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ হয় সে দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন। আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য তাই আজ যথাযোগ্য শিক্ষন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

❑ **শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমস্যাসমূহ (Problems of Teacher Education) ঃ**

শিক্ষক শিক্ষণের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি হল ঃ

(১) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঃ শিক্ষক শিক্ষণের একটি বড় সমস্যা হল, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এর বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা মোটামুটিভাবে তিন ধরনের —

(ক) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। প্রত্যেক স্ব স্ব প্রধান হয়ে কাজ করছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের নিতান্ত অভাব রয়েছে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা। পরীক্ষাগ্রহণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রেনিং কলেজগুলির বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না।

(গ) বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা। একমাত্র প্রাকটিস টিচিং এর সময় শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থাগুলির সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্য একটা সংযোগ হয়। অন্য সময়ে কোন সংযোগ থাকে না।

(২) পর্যাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অভাব ঃ অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলি নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং অবহেলিত। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব কোন পরিকাঠামো নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন Experimental School নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Laboratory, Library এবং অন্যান্য সরঞ্জামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকক্ষেত্রেই বেসরকারি এবং সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার অভাব দেখা যায়।

(৩) সীমিত ছাত্র গ্রহণ ক্ষমতা ঃ শিক্ষক শিক্ষণের বেশির ভাগ ছাত্রের গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত এবং তারা প্রতি সেশন মাত্র ১০০ জন ছাত্র ভর্তি করতে পারে। ১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারি কমিশন উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই ছাত্রসংখ্যা নূন্যতম ২০০ হওয়া প্রয়োজন যা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে কার্যকরী এবং অর্থকরী।

(৪) **অবাস্তব পাঠক্রম ঃ** শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমে বর্তমান এবং এই পাঠক্রম অনেকাংশেই বাস্তব নয়। এই পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কিছু জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত নিয়মমাফিক। আবার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সময়সীমা ধার্য করা হয়, তা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত নগন্য।

(৫) **ভ্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** শিক্ষার্থীরা কিছু ভাবতে চায় না, বুঝতে চায় না। তারা শুধু পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার কৌশলটি জানতে চায়। পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের উপর 'নোট' নিতে চায়। তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ডিগ্রী লাভ করা ছাড়া প্রশিক্ষণের কোন মূল্য নেই।

(৬) **ব্যবহারিক কাজের উপর কম গুরুত্ব দান ঃ** শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকতা বিষয়টির ব্যবহারিক দিকটি অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রাক্টিস টিচিং বিষয়টি অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবতা বর্জিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মনোযোগ, কল্পনাশক্তি এবং সময়জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো যার মাধ্যমে তারা পাঠটীকা প্রস্তুতির দ্বারা কিভাবে শ্রেণিকাজ সম্পূর্ণ করবে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে অবহেলা করে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠটীকার সমাপ্তির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়।

(৭) তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা তাঁদের লব্ধ জ্ঞান কিভাবে স্কুলগুলিতে প্রয়োগ করছেন এবং তাঁরা কি জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা দেখার কোন ব্যবস্থা (Feed back) নেই। এর ফলে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বাস্তব সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায় না। ফলে এখানকার পড়াশোনা গতানুগতিক পথ ধরে চলতে থাকে।

(৮) **আর্থিক অপ্রতুলতা ঃ** অনেকক্ষেত্রেই এই শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার ও অন্যান্য সংস্থার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পায় না। আবার যদিও গবেষণাকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অন্তর্গত একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ হিসাবে ধরা হয় তা সত্ত্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটেও খুব নূন্যতম অর্থের কথা বলা হয়। UGC, NCERT ও ICSSR-এর মতো সংস্থাগুলিও বর্তমানে শিক্ষকদের গবেষণার জন্য সকল সময় প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে পারে না।

(৯) নতুন ধরনের শিক্ষামূলক উপকরণ, কৌশল, গণমাধ্যম, কম্পিউটার নির্দেশিত নির্দেশনা, তথ্য ও সংযোগসাধন প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু অনেক শিক্ষকই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানেন না বলে তাঁরা এই সুযোগসুবিধাগুলি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন না। কর্মমধ্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির উপর সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার একবার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কর্মরত শিক্ষকদের রিফ্রেসার কোর্স বা ওরিয়েন্টেশনে যাবার সুযোগ ও কম থাকে।

(১০)**নিম্নমানের গবেষণার পদ্ধতি ঃ** শিক্ষন প্রক্রিয়ার উপর যে সমস্ত গবেষণা হয় সেগুলিও অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষামূলক নীতি বা শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপরেও যে সমস্ত গবেষণা হয় তাও অত্যন্ত নিম্নমানের। এর ফলে শিক্ষক শিখণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা বিভাগের উপরেও এবিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

১.৮.১ ❑ শিক্ষক শিক্ষণের মানোন্নয়নের উপায় অথবা শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানের উন্নয়ন ঃ

ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকের প্রায়ই অভাব দেখা যায়। মাঝে মাঝে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকেরা এইসব স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান করতে পারেন। এর ফলে স্কুলের যোগ্য শিক্ষকের অভাব দূর হবে। অধ্যাপকেরাও শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা ও সমস্যার বিষয়গুলি জানতে পারবেন। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় স্কুল ও ট্রেনিং কলেজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হবে।

(২) আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষকদের শিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যাবলির উন্নয়ন সাধনের জন্য NCTE কিছু সম্পদ কেন্দ্র (Resource Centre) প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(৩) বিভিন্ন কলেজে পরিদর্শন ও অনুমোদন দানের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা অবিলম্বে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পরিদর্শনের জন্য NCTE যে সমস্ত পরিদর্শককে নিয়োগ করে তাঁদের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের কলেজ সম্পর্কে ধারণা থাকে না। তাঁরা এই কাজের জন্য বহু টাকা T.A. হিসাবে অপচয় করেন। আবার পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও তাঁরা বহু অর্থের বিনিময়ে তাদের অনুমোদন পেতে সাহায্য করে। এই কাজে নিয়োগ করা যায় তাহলে শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৪) সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠনগুলির পাশাপাশি শিক্ষণের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশিক্ষণ দাতাদের যোগ্যতা, চাকুরির শর্ত, ছুটি, বেতন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নিয়মমাফিক করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবহার করতে হবে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গের সব ট্রেনিং কলেজগুলির একই পাঠ্যসূচী এবং একই শিক্ষাবর্ষ চালু হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে NCERT এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উদ্যোগ নিয়েছেন বলে প্রকাশ।

(৬) ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক গণ চাকরীতে থাকাকালীন রিফ্রেসার কোর্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে যাতে অংশ নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাঁদের জন্য গ্রীষ্ণবকাশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমানে এস. সি.ই.আর.টি (S. C. E. R. T) পশ্চিমবঙ্গ ট্রেনিং কলেজ অধ্যাপকদের জন্য এই ধরনের কিছু কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

৮.৯ ❑ অন্তর্ভূতিমূলক শিক্ষা (Inclusive Educatiuon) ঃ

১৯৯৪ সালে স্পেনে সালামানকা শিক্ষা অধিবেশনে প্রথম অন্তর্ভূতিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যেখানে ভারতবর্ষ একটি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে যোগদান করেছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত এই বিশ্বে সম্মেলনে 'সবার জন্য শিক্ষা' - এই আলোচনায় ঘোষণা করা হয়েছিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল শিশুকে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূতি করতে হবে। শিক্ষাগত অন্তর্ভূতিকে জাতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করার কথাও দাবী করেছে UNICEF.

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সম্পর্কে ১৯৯৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারায় বলা হয়েছে এই ধরনের প্রতিটি শিশুকে সর্বাপেক্ষা সবরকম ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এর ফলে সাধারণ শিশুদের সাথে সাথে এইসব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরও শারীরিক বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, ভাষাগত ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

অন্তর্ভূতিমূলক শিক্ষা বলতে যে ধারণা পাওয়া যায় তাকে সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এটি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে যে কোন প্রকৃতির সকল শিশু একত্রে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং সে ক্ষেত্রে যদি কোন কোন শিশু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হয় তাহলে তাদেরকে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা অনুসারে শিখণের সমসুযোগ ঘটিয়ে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেবার অপর নাম হল শিক্ষাগত অন্তর্ভূক্তি।

খুব সহজভাবে অন্তর্ভূক্তি শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যেখানে কোনো একটি সমাজে সকল শিক্ষার্থী একসঙ্গে কোন একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে এবং সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে অসুবিধা ভোগ করছে এমন শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার্থী তাদের অসামর্থ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়বে।

৮.৯.১❑ অন্তর্ভূক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Inclusive Education) ঃ

(১) সাধারণ শিশুদের যে ধরনের শিক্ষার সুযোগ আছে ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের সুযোগ আছে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরও সেই একই রকম সুযোগ দেওয়া।

(২) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যে প্রথমে শিশু তারপর কোন কারণে ব্যাতিক্রমী একথা সমাজকে বোঝানো।

(৩) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা।

(৪) সমন্বিতকরণ ও অন্তর্ভূক্তিকরণ এমন একটি কার্যকরী পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও সাধারণ শিশুদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে তাদের পরবর্তীকালে সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন ভাববিনিময় করা সহজ হয়।

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা উভয়প্রকার শিক্ষাব্যবস্থাতেই মূল কথা হল প্রতিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে তার ক্ষমতা, অক্ষমতা, চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণ সুযোগ দানের মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব ও যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যালয়ের সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলা ও তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ দান করা, ব্যতিক্রমী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এই যে বিদ্যালয়ে, সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ দান, সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে দেওয়া একেই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Main Streaming। প্রকৃতপক্ষে সমন্বিত শিক্ষার ধারণা থেকেই এসেছে এই Main Streaming এর ধারণা।

৮.৯.২❑ অন্তর্ভূক্তি শিক্ষার সমস্যা (Problems of Inclusive Education) ঃ

অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল সেই সব শিশুকেই শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা যাদের মূলস্রোতের শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে। এই যে মূল শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে সামাজিক কারণ আছে — অনেক শিশু

স্কুল-পোষাক, বা সামান্য যেটুকু বেতন দিতে হয় তা বা খাতা-বই যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুর ব্যয়ও বহণ করতে পারে না। জাতিগত, ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার জন্যও অনেক শিশু শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়। এমন অনেক স্কুলের পরিবেশের কারণে স্কুল ছেড়ে দেয়। শিক্ষকদের নেতিবাচক মনোভাব, অসহযোগিতা কিংবা যান্ত্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। তাই শারীরিক, মানসিক, সামাজিক নানা দিক থেকেই প্রতিবন্ধকতার কারণে শিশুদের বিশেষ চাহিদা সৃষ্টি হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হয়।

(i) সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন দক্ষতা বৃদ্ধির অভাব ঃ অন্তর্ভূক্তি শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের জন্য সাধারণ স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষালাভ ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয় যাতে তাঁরা সবার চাহিদা বুঝতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। প্রশিক্ষণজনিত অভাবে সাধারণ শিক্ষক বিশেষ চাহিদাগুলি চিহ্নিত করতে পারেন না ও সঠিক শিক্ষাদানের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না।

(ii) বিদ্যালয়ে সরঞ্জামের অভাব ঃ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক এক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাব থাকে। ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকর হয় না এবং পরীক্ষাতে তারা ভাল ফল দেখাতে পারে না।

মানবশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের আদানপ্রদানের অভাব ঃ এই শিক্ষাব্যবস্থাটি এমন একটি কার্যক্রম যেখানে সমগ্র সমাজকে যুক্ত হতে হয়। কাজেই সামাজিক উন্নতির জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের পারস্পরিক চিন্তা ও কাজের যোগাযোগের ওপর এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, সমন্বিত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মী, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশেষ স্কুল, বেইল সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সঠিক আদান-প্রদান না থাকায় এই শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য ব্যাহত হয়।

নমনীয় পাঠক্রম সহ পাঠক্রমের অনুযুক্ত ব্যবস্থা ঃ যদিও অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল সবার জন্য যতদূর সম্ভব একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করা। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ পাঠক্রমের ও সহপাঠক্রমের প্রয়োজন হয়। যেমন ভাষা শিক্ষার জন্য শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিশেষ পাঠক্রম অবশ্যই প্রয়োজন। আবার ভূগোলে মানচিত্র অঙ্কন বা রেখাচিত্র অঙ্কনের জন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হয় কিন্তু বিদ্যালয়ে এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি থাকায় শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে না।

প্রতিকূল বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ প্রতিকূল পরিবেশের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষার্থীর অনুকূল না হয় তাহলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তকর হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

শিক্ষকদের উপযুক্ত মানসিকতা ও বিদ্যালয় পরিসেবার অভাব ।

সাধারণ ছাত্ররা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে পড়ার ফলে এদের অগ্রগতি ব্যহত হতে পারে।

৮.৯.৩ ❑ অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার অগ্রগতি (Propect of Inclusive Education)

সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যোগানের জন্য ''National Institute for Orthopedically Handicapped''-এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। চিহ্নিত প্রতিবন্ধী শিশুদের যন্ত্রপাতি যোগানের জন্য ALIMCO (Artificial Limb Manufacturing Company of India) এবং NIOH একই সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের ৫১৫টি সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫টি দৃষ্টিহীনদের জন্য উপকরণ, ৩০টি শ্রবণ সংক্রান্ত উপকরণ এবং ৪০০টি বিকলাঙ্গদের জন্য যন্ত্রপাতি। এটা করা হয়েছে NGO-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবং ALIMCO-এর কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে।

স্কুলে ভর্তি হওয়া সমস্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্ত সুযোগসুবিধা যোগান দেওয়ার জন্য IEDC (Intergrated Education for Disabled Children)-এর সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা যেমন বই, পোশাক, খাতা, পেন, যাতায়াত খরচ ইত্যাদিও প্রদান করা হয়। IEDC পরিকল্পনার সহায়তায় একটি সহায়ক কেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও ভাবা হচ্ছে। স্কুলে পাঠরত প্রতিবন্ধী শিশুদের IEDC-এর আওতায় নিয়ে আসতে ৫টি জেলায় চিহ্নিতকরনের জন্য বিশেষ পরিদর্শন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ঃ শুরুতে SRG সদস্য এবং রাজ্যস্তরের সহায়তাকারী সংস্থার বিশেষগৃহের দ্বারা দক্ষ ব্যক্তি ও দক্ষ প্রশিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যবর্তী ব্লকগুলির প্রতিটি স্কুলের একজন করে শিক্ষকের জন্য ৬-দিনের একটি জোরালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা ছিল ৪০ ঘণ্টার একটি প্রশিক্ষণ যার মধ্যে ১০ ঘণ্টা ছিল বিশেষ শিক্ষার প্রতিটি এলাকাতে প্রশিক্ষণ। এই সমস্ত শিক্ষকদের মতো রাজ্যস্তরের সংস্থার দ্বারা সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যস্তরের বিশেষজ্ঞরাও উপকরণ গঠন করেছিলেন বা প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এই প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান হয় SRG (State Resource Group) এবং SPO (State Project Officer)-এর মাধ্যমে এবং এর নিয়ন্ত্রণ হয় SPO/DPO থেকে। এখনও পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৬৯০ জন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

বাছাই করা জেলাগুলিতে সমস্ত শিক্ষকদের জন্য ২দিনের 'সাধারণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ'-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫০৫৬জন সাধারণ শিক্ষককে IED (Integrated Education for Disabled Children) বা প্রতিবন্ধীদের সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য ও বিভিন্ন ধরনের শিশুদের প্রতি শিক্ষকদের অনুভূতিপ্রবণ করে তোলার জন্য SPO এবং DPO Pedagogy Unit-এর মাধ্যমে জেলাগুলিতে Orientation-এ বিশেষত শিশুদের প্রতি মনোনিবেশকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৫-এর Disabilities Act অনুসারে প্রতিটি শিশুর আরও উপযোগী পরিবেশ স্থান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৮.১০ ❑ বৃত্তি শিক্ষা (Vocational Education) :

শিক্ষার বহুবিধ লক্ষ্যের মধ্যে শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গঠন করা একটি অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জ্ঞান অর্জন, আজ আর একথা কেউ মনে করেন না। হার্বার্ট স্পেনসার শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ

জীবনের উপযোগী করে গঠন করার একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে বাস্তবমুখী করে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে শিশু সমাজজীবনের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ হয়। সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে হলে শিশুর ভবিষ্যতের বৃত্তি কী হবে, সে কীভাবে জীবিকা অর্জনে সমর্থ হবে তা প্রথমেই নির্ধারণ করা আবশ্যক। সুতরাং অনেকে মনে করেন স্কুলেই এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে শিশুরা তাদের ভবিষ্যতের বৃত্তি কী হবে তা ঠিক করে নিতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে শিশুকে এমন কতকগুলি সামর্থ্য অর্জনে সাহায্য করা যাতে সে তার জীবিকা অর্জন ভবিষ্যতে ঠিক মত করতে পারে।

● **বৃত্তিমুখী শিক্ষার সুবিধা :** শিক্ষাকে যদি বৃত্তিমুখী করা হয় তবে তার দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবনে বহু সমস্যার সমাধান হবে। বৃত্তিমুখী শিক্ষার সুবিধা হল :

(১) বৃত্তিশিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী সহজে ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জনে সমর্থ হবে। তার স্বনির্ভরতা আসবে। সে সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের ফলে তার মধ্যে সমাজ কল্যাণকর কাজের প্রেরণা আসবে। তার নৈতিকবোধ জাগ্রত হবে।

(২) শিক্ষার্থী যদি তার ভবিষ্যতের বৃত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে তবে তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা তার কাছে অর্থবহ হবে।

(৩) বৃত্তি সম্পর্কিত সঙ্গতি বিধান হলেই শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্য, যথা— সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান, চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ সৃষ্টি ইত্যাদি সার্থক হয়ে উঠবে।

(৪) নির্বোধ বা ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। তারা প্রচলিত পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না। তারা হাতের কিছু কাজ করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজের পরগাছা হয়ে থাকবে না।

(৫) বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা যে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়েছে তাকে সমাজের সকলে শ্রদ্ধা করে, মর্যাদা দিয়ে থাকে। ফলস্বরূপ ব্যক্তির মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি বজায় থাকে।

(৬) আমাদের দেশ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু পর্যাপ্ত বৃত্তিগত শিক্ষার অভাবে আমরা সেগুলি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারি না। আবার আমাদের দেশ উৎপাদনগত দিক থেকে অন্য দেশের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষদের মধ্যে উৎপাদনমুখীনতার সৃষ্টি করে। এভাবে দেশের সম্পদ সমূহেরও সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদেরও উন্নয়ন ঘটে।

৮.১০.১ Problems of Vocational Education (বৃত্তি শিক্ষার সমস্যা) :

দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষার দ্রুত বিস্তারলাভ ঘটে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। সেগুলি হল :

(১) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব : বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি অধিক বেতনে কলকারখায় চাকরি গ্রহণ করা ভাল মনে করেন। তাঁরা কারিগরী বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।

(২) **উন্নতমানের প্রশিক্ষণের অভাব :** বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষকদের সেরকম উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিশিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

(৩) **সহযোগিতার অভাব :** সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাব ও সমস্যার অন্যতম কারণ। বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু শিক্ষা অধিকর্তা, কিছু শ্রম অধিকর্তা এবং কিছু শিল্প অধিকর্তারা অন্তর্গত। এর ফলে সমস্ত বিভাগের মধ্যে যদি যথাযথ সংযোগসাধন গড়ে তোলা না হয় তাহলে সামগ্রিক বৃত্তিশিক্ষার উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

(৪) ভারতবর্ষের মতো দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দক্ষ কারিগরদের বা শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। অনেকক্ষেত্রেই তারা কাজের যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। ফলে বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ও স্বাভাবিক ভাবেই কম দেখা যায়।

(৫) বৃত্তিশিক্ষার জন্য একটি সামগ্রিক সমন্বয়িত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজন। এই ধরনের কোর্সে একটি বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য বিষয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সমস্ত বিষয়গুলি এর মাধ্যমে পড়ানো হয় না। যে সমস্ত বিষয়গুলি এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেবল সেই বিষয়গুলি অনুবন্ধ নীতি দ্বারা পাঠদান করা উচিত। কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতির যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

(৬) আমাদের দেশের মানুষের বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে উদার মানসিকতা নেই। অনেকেই এখনও পর্যন্ত মনে করে বৃত্তিশিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা নিম্নমানের। কিছুদিন আগেও ওই মানসিকতা প্রচুর পরিমাণে দেখা গেছে। সেই কারণে বৃত্তিশিক্ষার অগ্রগতি অনেকটা মন্থর হয়েছে।

(৭) বৃত্তি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রয়োগ এর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। বৃত্তিশিক্ষার বিভিন্ন কোর্সগুলি প্রয়োজনীয় কর্মী বা আর্থিক পরিকাঠামো ছাড়াই প্রয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে বৃত্তিশিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি।

(৮) বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের পর উপযুক্ত চাকুরির সুযোগ আমাদের দেশে খুবই কম। ফলে অনেকেই বৃত্তিশিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব বোধ করছে।

৮.১০.২ Prospect of Vocational Education (বৃত্তিশিক্ষার অগ্রগতি) :

বৃটিশ যুগে আমাদের দেশে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সময় কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় (১৯০৬)। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবর্গ কারিগরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রসারের জন্য যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে এদেশে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন।

স্বাধীনতার পর অন্যান্য রাজ্যগুলির মত পশ্চিমবঙ্গেও পরিকল্পনা অনুসারে বৃত্তিশিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় ২০০৫ সালের জানুয়ারী থেকে কয়েকটি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও

আর্থিক সহায়তায় বিশ্বব্যাঙ্কের একটি দীর্ঘমেয়াদি কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার গুণমান কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি হল টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে টেকিককপ। বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের চারপাশে অতিদ্রুত পরিবর্তন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তাকে যেভাবে পরিবর্তিত করেছে তা সম্ভবত ইতিহাসে কোন শতাব্দীকালে আর ঘটেনি। ফলস্বরূপ বেড়েছে নতুন নতুন Engineering এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার চাহিদা এবং তা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বেড়েছে নানা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। নতুন স্নাতক স্তরের মহাবিদ্যালয়ের পাশাপাশি ১,৬০০টি নতুন ITI, ১০০০০টি নতুন Vocational School এবং ৫০০০০ নতুন Skill Developement Centre তৈরী হবে আশা করা যায়। সেক্ষেত্রে Polytechnic, ITI ও VE and ITI তে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও।

স্বাধীনতার পর বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে এবং মানব সম্পদেরও অভাব নেই। সুতরাং এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য মানব শক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনার সবিশেষ প্রয়োজন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা যত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, দেশের উৎপাদনও তত বাড়বে। এবং সমাজ ততই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষ একটি উন্নতিশীল দেশ। এর নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা বেকারত্ব অন্যতম। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে নিছক কেতাবী শিক্ষায় কাজ হবে না। তরুণদের শিক্ষাকে আজ বৃত্তিমূখী করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক করতে হবে।

গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করতে চেয়েছেন। তিনি একটি হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীনিকেতনে নানারূপ বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

৮.১১ ❑ সারসংক্ষেপ (Summing Up) :

ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরাজ সরকার ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সার্বজনীন করা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল ছিল না। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ তার সংবিধানের 45 নং ধারায় বলেছে সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে 14 বছর বয়স পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান নারী, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার চাহিদা পূরণের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছে। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার সমস্যাগুলি হল অর্থের অভাব, জনসংখার বিস্ফোরণ, সরকারী উদাসীনতা, অভিভাবকদের নিরক্ষরতা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। কিন্তু মাধ্যামিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট ভালো। ভারতবর্ষের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, রক্ষণশীল মনোভাব, সরকার ও জনসাধারণের উদ্যোগের অভাব মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের পর উপযুক্ত চাকুরির

সযোগ আমাদের দেশে খুবই কম। ফলে অনেকেই বৃত্তিশিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাববোধ করছে। মাধ্যমিকস্তরে বৃত্তিশিক্ষার উন্নতি ঘটবে। ভারতবর্ষে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যববস্থারও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে যেমন, আর্থিক অপ্রতুলতা, শিক্ষণের অকার্যকর পদ্ধতি, পেশাগত মর্যাদার অভাব ইত্যাদি। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিসেবার অভাব রয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজাতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভাব বেশ কিছুটা কমানো সম্ভবও হয়।

৮.১২ ❑ প্রশ্নাবলী (Questions) ঃ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(1) সর্বশিক্ষা অভিযানের বিশেষ তাৎপর্য কি?

(2) বৃত্তিশিক্ষা বলতে কি বোঝেন?

(3) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কি?

(4) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কাদের বলা হয়।

(5) সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা বলতে কি বোঝেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(1) ভারতবর্ষে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমস্যা সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(2) সর্বশিক্ষা অভিযানের সমস্যা কি?

(3) বৃত্তিশিক্ষার সুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

(4) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমস্যা আলোচনা করুন।

(5) নারীশিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(1) শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করুন।

(2) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষক, শিক্ষিকাদের কোন কোন বিষয়গুলির উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার।

(3) বৃত্তিশিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

(4) পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধানগুলি আলোচনা করুন।

(5) ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার অন্তরায়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন।

৮.১৩ ❑ উৎস (References) ঃ

(1) Banerjee, S.N. History of Education in India

(2) Chakraborty, S.C. Modern Indian Education

(3) Agarwal, J.C. (2005) Recent Development and Change in Education

(4) আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা - ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, শেখ হামিদুল হক।

(5) ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা - সরোজ চট্টোপাধ্যায়।

(6) শিক্ষা ও সাম্প্রতিক সমস্যাবলি - ড. জয়ন্ত মেটে, ড. রুমা দেব, ড. বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ।

(7) সাম্প্রতিককালীন ভারতীয় শিক্ষার ধারা - ড. দেবাশিষ পাল, ড. দিলীপ কুমার ঠাকুর, হামিদুল হক।